বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

শাহীন আখতারের ছোটগল্প: নারীর স্বর ও স্বরায়ণ

খন্দকার ফারহানা রহমান*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার গল্পকার শাহীন আখতারের ছোটগল্পগুলো মূলত নারী-প্রধান। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় অনেক নারী-প্রধান গল্পের উপস্থিতি থাকলেও নারীর নিজস্ব স্বর সুস্পষ্ট নয়। সে দিক থেকে শাহীন আখতার স্বতন্ত্র। তিনি একই সঙ্গে সমাজকর্মী। নারীর কর্মক্ষমতা, নারী-অধিকার, লিঙ্গবৈষম্য, নারীর শরীরী অধিকার, নারী-সমকাম, তৃতীয়লিঙ্গ– এমন স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে সচেতন শিল্পদক্ষতায় শাহীন আখতার তাঁর ছোটগল্পে রূপদান করেন। নারীবাদের কোনো একক তত্ত্বের ওপর যদিও তিনি নির্ভরশীল থাকেন না, তথাপি আধুনিক নারীবাদী তত্ত্বের একাধিক ধারার অনুষঙ্গে তাঁর ছোটগল্পসমূহকে পাঠ করা যায়। তাঁর রচিত ছোটগল্প বাংলাদেশের সংস্কৃতি-পাঠের ক্ষেত্রেও জরুরি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শাহীন আখতারের ছোটগল্পের ভুবন যে নারীবিশ্বের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটায়, তাতে নারীর কথিত-অকথিত, জানা-অজানা, স্বীকৃত-অস্বীকৃত অসংখ্য বয়ানকে হাজির করে।

চাবি শব্দ: ছোটগল্প, নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, লিঙ্গবৈষম্য, নারী-অধিকার, নারী-সংহতি।

ভূমিকা

সমকালীন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিজের প্রভাবশালী অবস্থান ক্রমদৃঢ় করে চলেছেন শাহীন আখতার (জন্ম ১৯৬২)। ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ, নির্মোহ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং গল্প বলার নতুনতর পদ্ধতিতে তাঁর লেখকসত্তা পরিচিহ্নিত। *তালাশ* (২০০৪), *ময়ূর সিংহাসন* (২০১৪), *সখী রঙ্গমালা* (২০১০), *অসুখী দিনে*-র (২০১৮) মতো শৈল্পিকতায় উত্তীর্ণ উপন্যাসে ঐতিহাসিক আবহের প্রাধান্য থাকলেও ছোটগল্পকার হিসেবে শাহীন আখতার সমকালীন ও সমসাময়িক।[১] উল্লেখ্য, শাহীন আখতারের সমকালের পরিধি তুলনামূলক বৃহৎ ও বিশদ। এটি অর্ধযুগ, এক যুগ বা দুই যুগের জীবনকাঠামোয় সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বাংলাদেশ-পর্বের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুরো সময়কে ধারণ করে। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পটভূমি হিসেবে ঔপনিবেশিকতা থেকে স্বাধীনতা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, স্বাধীনতার পূর্বাপর সময় থেকে ঘটমান বর্তমানের রোহিঙ্গা-পরিস্থিতি পর্যন্ত তাঁর ছোটগল্পের পরিধি বিস্তৃত থাকে। তাঁর ছোটগল্পে সমকাল কেবল দৈশিক পরিধিতে আবদ্ধ নয়, বরং আন্তর্জাতিকতাকে ধারণ করে নির্বিবাদে দৈশিক ও বৈশ্বিক। তাঁর ছোটগল্পসমূহের স্থানিক পরিধি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, জেলা শহর, মফস্বল শহর, ছোটশহর,

---

* প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

গ্রাম, প্রান্তিক তথা প্রত্যন্ত জনজীবনের সঙ্গে সংলগ্ন। ছোটগল্পে কাহিনি-বয়ানের যে শিল্পভাষ্য নির্মাণ করেন শাহীন আখতার, অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতাসমেত নারীকথন তার বড় অংশ জুড়ে থাকে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক এবং একুশ শতকের শূন্য ও প্রথম দশকে লেখা শাহীন আখতারের ছোটগল্পে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনিতে উপস্থিত থাকে বিচিত্র শ্রেণি-পেশা-সামাজিক অবস্থানে জীবনযাপন করা নারীরা। তাঁর ছোটগল্পে উপস্থিত নারীরা গল্পের প্রধান, অপ্রধান বা পার্শ্বচরিত্র হিসেবে এসেছে; তুলনামূলক কম উজ্জ্বলভাবে আসে পুরুষ চরিত্র। বাংলাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক উপাদান-উপকরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপস্থিত হয় শাহীন আখতারের ছোটগল্পে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের অংশ হিসেবে থাকার অভিজ্ঞতা, দেশভাগের আশাভঙ্গ ও প্রত্যাশা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের স্বাধীনতা অর্জন যুগপৎভাবে এদেশের সমকালীন মানুষের স্মৃতিসত্তায় গভীরভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। শাহীন আখতারের গল্পগুলো এই বৃহৎ সমকালীন সময়বাস্তবতায় জারিত হয়ে ব্যক্তির অভিজ্ঞতামালার এক রঙিন কার্নিভালের রূপ লাভ করে। নারীকথন শাহীন আখতারের গল্পে নির্জলা তাত্ত্বিক নারীবাদী সাহিত্য নয়; ব্যক্তি-মানুষের আনন্দ-বেদনা-সংকট সম্ভাবনার বিপুল ক্যানভাস–যেখানে ব্যক্তি-মানুষটি জেন্ডারের পরিচয়ে একজন নারী। ছোটগল্পে নারীসত্তার সমগ্রতাকে অবলীলায় শৈল্পিক সংহতিতে উন্মোচন করেছেন লেখক। বর্তমান আলোচনায় শাহীন আখতারের ছোটগল্পে নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনবয়ানের দেখা-অদেখা স্বরূপ আলোচিত হবে।

বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবস্থান, নারী-লেখক, বিশেষত মুসলমান নারী-লেখকের সাহিত্যচর্চা লেখক শাহীন আখতারের আগ্রহের বিষয়। উপন্যাসে যেমন ঐতিহাসিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন গল্পকার, ছোটগল্পের কাহিনির বয়ান-কৌশলে এবং চরিত্রের সংকটপূর্ণ জীবনযাত্রার রূপরেখা নির্মাণে তা অটুট থাকে। তথাপি নারীর প্রতি তাঁর সুচিন্তিত ও গভীরতর সহমর্মী সমর্থন স্পষ্ট থাকে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি নারীর মানসিক অবদমন রূপায়িত হয়েছে মূলত পুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে। তুলনামূলকভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রভাবশালী অবস্থানের প্রাধান্য আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নারীরা যেমনঃ মনসা, বেহুলা, রাধিকার তুলনায় কপালকুণ্ডলা, রোহিণী, চারুলতা, কুমু, বিনোদিনীর জীবনকাঠামোতে প্রকাশিত হয়েছে এমন সব সংকট, যার মধ্যে পৌরুষেয় মানসতার প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় অনেক বেশি। আদি থেকে বাঙালির জীবনাচরণের মধ্যে নারীর অবদমিত অবস্থাকে শনাক্ত করা গিয়েছে। আর্য ও অনার্য উভয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বাঙালি নারীর অবদমিত অবস্থার কথা ইতিহাসের সুপ্রাচীন কাল থেকে আছে। আদি বাঙালি সংস্কৃতি পরিবার-প্রথার ছকে বেঁধে নারীকে সামাজিক আচারনিষ্ঠার প্রতীকে পরিণত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নারী' প্রবন্ধে বাঙালি নারীর এই অবস্থার কথা উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সমাজবন্ধনে নারী অগ্রজের ভূমিকা পালন করে। তথাপি সমকালীন ভারতবর্ষে নারীর হীন অবস্থার জন্য কিছু সীমাবদ্ধতাকে সুচিহ্নিত করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত উল্লেখযোগ্য:

> তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এইজন্যে নির্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে।[২]

বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত এই সীমাবদ্ধতা মূলত সামাজিক অধিকার প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা এবং এই বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ।

সতীদাহ-সহমরণ কিংবা অবরোধ প্রথার মতো যুগজীর্ণ বিষয়ের অবসান হলেও তৃতীয় বিশ্বের বাংলাদেশে নারীবান্ধব প্রতিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক নারীর মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা হলেও সমকালীন পরিবার ও সমাজে এর প্রয়োগ দেখা যায় না। বাংলাদেশে নারীর অবদমিত অবস্থান লেখক শাহীন আখতারকে ব্যথিত করেছে। তাঁর ছোটগল্পে ভিড় করেছে পরিবার, সমাজ-প্রতিবেশ ও পেশা-সূত্রে চেনা-শোনা বিচিত্র পরিচয়ের নারীরা। নারীর প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আধুনিক সময় পরিসরে নারীর বৈষম্যপূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতা ও অবদমিত মানবসত্তার সকরুণ সুরটিকে বিচিত্র স্বরগ্রামে চিহ্নিত করেছেন শাহীন আখতার। পারিপার্শ্বিক জীবনে যে লাঞ্ছনা ও মর্মবেদনা নারীর জীবনে বহুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে স্বপ্ন দেখান লেখক। নারী হিসেবে অন্য নারীর প্রতি এই সহমর্মী দায়বোধ শাহীন আখতারের সহজাত শিল্পবোধের মর্মমূল থেকে উৎসারিত। এ প্রসঙ্গে মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক বলেন: 'তাঁর গল্পের সময়, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, নাগরিক পরিবেশ, নাগরিক মনোলোক, গ্রামীণ ও নাগরিক চরিত্রের নানা বর্ণবৈচিত্র্য ও জীবনের বাস্তবতাকে এমনভাবেই স্পর্শ করেছে – যা তাঁর নিজস্ব সহৃদয়তা ও সৃজনশীলতাকেই প্রকাশ করেছে।'[৩] স্বীয় সমাজ-দেশ-স্বজাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সাহিত্য সৃজন করেন সমকালীন সাহিত্যিকগণ। ছোটগল্পে শাহীন আখতার নারীর দিকে তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রকে নিবদ্ধ রেখেছেন। বিগত শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর দুই দশক ধরে জারি থাকা রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতিসত্তা গঠনের কালে সাহিত্য কলাকৈবল্যবাদিতায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। ফলে আধুনিক সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিচিত্র ঘটনাপঞ্জি এই সময়ের সাহিত্যে বিষয় হিসেবে এসেছে। সমাজ-পরিবর্তনের প্রয়োজন বা সামাজিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে শাহীন আখতার বলেন: 'আপাতদৃষ্টিতে থাকতে পারে আবার নাও পারে। সামাজিক দায়বদ্ধতা মোটাদাগের বিষয় নয়। একটা ভালো লেখা থেকে সমাজ নানাভাবে উপকৃত হয়।'[৪] এই মন্তব্যে লেখকের সমাজ-সচেতন সত্তার পরিচয় মেলে। সমকালীন বাঙালি নারীকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলে সেই সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন শাহীন আখতার।

বাংলাদেশের সাহিত্যে নারী-পরিস্থিতি

বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্য পর্যালোচনাসূত্রে বলা যায়, উনিশশো সাতচল্লিশের পর থেকে একাত্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্যে নারীর যে সামাজিক জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে নিরপেক্ষ বলা যায় না। এদেশের সাহিত্যে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরের উত্তাল রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রসঙ্গত রাজনৈতিক পালাবদল এবং জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি গড়ে ওঠার যুগে ব্যক্তির আচরণ, ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির মানসিকতা সাহিত্যে কম গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে পাকিস্তান-পর্বে ব্যক্তির অধিকার ও সচেতনতাবোধের একটি বিশাল দ্বার উন্মোচনের প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়। ফলস্বরূপ – বাংলাদেশের সাহিত্যে এদেশের

মানুষের জীবন-সর্ম্পক-মনোলোক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; সাহিত্যে গুরুত্ব পেতে থাকে নারী। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর নারীকে সাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের সাহিত্য এর মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পা রাখে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে এ সংক্রান্ত কিছু মৌলিক তথ্য। এই সূত্রে গবেষক ইলোরা সেহেবুদ্দিনের গবেষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ:

> In the postpartition era, for political and nationalist reasons, historians of both Pakistan and Bangladesh have largely disregarded the history of East Pakistan. The twenty-four years of united Pakistan (1947-71), however, merit attention for the groundwork laid for future feminist, labor, political, and cultural activism in both countries.[৫]

এই মন্তব্যের সূত্র ধরেও বলা যায়, বাংলাদেশের জন্মের পরবর্তী সময়ে নারীবাদী সাহিত্যের একটি ধারা নিজের সকল সম্ভাবনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেয়।

আবহমান বাংলা সাহিত্যে নারীর যে চিত্র দেখা যায়, প্রকৃত নারীকে তাতে পুরোপুরি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারীর ধারণা ইংরেজি সাহিত্য ও ভিক্টোরীয় নারীভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। সে তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীর যে ছবি পাওয়া যায়, তা আধুনিক যুগের তুলনায় ভিন্ন। ধর্মীয় আবর্তের মধ্যে থাকলেও মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীকে কিছুটা সজীব মানুষ হিসেবে সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য:

> তুলনায় মধ্যযুগের কবিদের লেখায় জটিলতা কম, নারীর ব্যাপারে চালাকি বা লুকোছাপার বালাই নেই বললেই চলে। নারীর রূপবর্ণনায়, যৌন-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করায় তারা যেমন দিলদরিয়া, সতীত্ব রক্ষায় তেমন খড়গহস্ত। সেকালের কাব্যের প্রাণভোমরাই যেন নারী। হালে যে সে কেন্দ্রচ্যুত, তার কারণ কি সাহিত্যিকদের নারীকে অগ্রাহ্য করার পুরুষালি মনোভাব, না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব – এককথায় বলা মুশকিল। পুরুষের বেশিরভাগ লেখায় নারী আজ শুধু অনুষঙ্গ হয়ে আসে।[৬]

সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীর প্রকৃত সত্তা ও অস্তিত্বের সংগ্রামকে সাহিত্যে তুলে আনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার নারীবাদী সাহিত্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাশ্যের পেছনে কার্যকর থাকে রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক সংঘের ভেতরে থাকা নৈরাজ্য অপরদিকে নারীর প্রতি চলে আসা অনাচারের ভেতরে কার্যরত থাকে বহুযুগের জীর্ণ ও সংকীর্ণতাপূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক ঈর্ষা ও শোষণের প্রত্নসত্তা। উল্লেখ্য, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা প্রচলিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের চেয়ে মাত্রাগত পর্যায়ে আলাদা। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবকেন্দ্রিকতাবাদ নারীর যে আদর্শায়িত রূপমূর্তি তুলে ধরে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীর এই চিত্রকে খণ্ডিত বা আংশিক বলাটা সমীচীন। এই সূত্রে আনিসুজ্জামানের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> বাংলা সাহিত্যে নারীর যে প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে, তা বহুবর্ণ ও বহুমাত্রিক, তা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময়, তা ভালোবাসার রঙে ও ঘৃণার তুলিতে আঁকা।
>
> নারীর যে-ভাবমূর্তি আমাদের সাহিত্যে দেখা যায়, তা বহুলাংশে পুরুষের সৃষ্টি। পুরুষ শুধু নিজের চোখ দিয়ে নারীকে দেখেনি, কী দৃষ্টিতে নারী পুরুষকে অবলোকন করেছে, পুরুষ সম্পর্কে, নিজের সম্পর্কে জগৎ সংসার সম্পর্কে নারী কী ভেবেছে, অধিকাংশক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যা করেছে পুরুষই। নারীর নিজস্ব জগতের খতিয়ান এবং নারীর নিবিড়তম অনুভূতির পরিচয় পুরুষ লিখে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তা যে নারীর জীবন ও ভাবজগৎকে বড়ো রকমের প্রভাবিত করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। নারী যখন নিজের কথা বলতে শুরু করেছে, তখন পুরুষের লেখা থেকে তার জানা হয়ে গেছে, ভালোবাসলে, ঘৃণা করলে, কষ্ট পেলে, দুঃখ দিলে নারীর অনুভূতি কেমন হয়।[৭]

এভাবে বাংলা সাহিত্যে নারীর আবেগানুভূতির যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে নারীর বাস্তব চিত্র অনুপস্থিত। বরং নারী সম্পর্কে একটি বিপরীত বয়ানকেই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ যখন নানা ভাঙন-পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে একেবারেই স্থিতিশীল নয় – এরূপ একটি সমাজে বসবাসকারী নারীর জেন্ডার-সীমাবদ্ধ জীবনবাস্তবতা নানাভাবে বিপর্যস্ত ও শূন্যতা-আক্রান্ত। সমকালীন নারীর বাস্তবচিত্র সাহিত্যে তুলে আনতে সচেষ্ট শাহীন আখতার। শাহীন আখতারের ছোটগল্পের নারীরা প্রচলিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়ান পদ্ধতিতে দেখানো নারীরূপ থেকে স্বতন্ত্র।

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নারীবাদের অংশ। নারীবাদী সাহিত্যধারাকে বাংলা সাহিত্যে তুলে আনছেন বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা নারী-লেখক।[৮] বাংলাদেশের নারী-লেখকমাত্রই (Women writer) নারীবাদী লেখক (Feminist writer) নন; তথাপি এই লেখকদের লেখায় নারীর জীবন বিস্তৃত পরিস্থিতিসহ উপস্থিত থাকে, যা পুরুষ-লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যসহ চিহ্নিত করা যায়। এঁদের লেখায় নারীর কণ্ঠস্বরকে স্পষ্টগ্রাহ্যভাবে অনুধাবন করতে পারে পাঠক। ফেমিনিস্ট সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বলা হয়:

> Generally, then, the female writer is seen as suffering the handicap of having to use a medium (prose writing) which is essentially male instrument fashioned for male purposes. ... If normative language can be seen as some way male-oriented, the question arises of whether there might be a form of language which is free from this bias, or even in me way oriented towards the female.[৯]

আরও উল্লেখ্য, ইংরেজি সাহিত্য উনিশ ও বিশ শতকের দীর্ঘ সময় জুড়ে নারীর স্বাভাবিক জীবনের বিপরীত বয়ানকে বর্ণনা করে গেছে। নারীবাদী লেখকদের একটি বড় অংশ নারীর কথা সাহিত্যে তুলে আনতে নারী-লেখকদের আহ্বান জানিয়েছেন। এই নতুন ধারার সাহিত্য নারীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে পুরুষতান্ত্রিকতার বিপরীতে নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তবতাকে সাহিত্যে তুলে আনতে সক্ষম। খোদ ইংরেজি ভাষার সাহিত্যেও নারীর কণ্ঠস্বর পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্টরূপে পাওয়া যায় না। যে কারণে বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যে নারীর কণ্ঠস্বর চিহ্নিত করার চিন্তাটি সজোরে আলোচিত হচ্ছে:

> In order to write about women writers, and remain respectable as In critics, a new definition of literature was going to have to be established. 'English' needed a new map. On top of that, it requires a different conception of the practice of criticism to take the sex of the author into consideration.[১০]

সমকালীন বাংলাদেশের নারীবাদী লেখকদের মধ্যে বৈচিত্র্যে ও স্বাতন্ত্র্যে শাহীন আখতার প্রাতিস্বিক। জীবনঘনিষ্ঠ লেখক শাহীন আখতার তাঁর *গল্পসমগ্র-১* উৎসর্গ করেছেন তাঁর নিজের চেনাজানা জগতের সৃজিত চরিত্রসহ অনেক নারীকে, যারা তাঁর অভিজ্ঞতালোকে স্মৃতিচ্ছায়া হয়ে মিশে থাকে। এই নারীরা মূলত সাধারণ মানুষ। এদের জীবন চিরচেনা হলেও সাহিত্যে অনুচ্চারিত বলে অচেনা। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকাঠামোতে ভূমিনির্ভর স্মৃতিসত্তার উত্তরপ্রজন্ম বাংলাদেশে নারী জনগোষ্ঠীর বর্তমান সামাজিক অবস্থান ও অবস্থা মূলত কী এবং কীই-বা তার মনোজগতের অবস্থা ও মানবিক

উপলব্ধি, এসকল বিষয়ের খোঁজ-খবর পাওয়া যায় শাহীন আখতারের গল্পে। বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোতে বহু সংস্কৃতির মিশ্রণে বিস্তর আচার-নিষ্ঠা ও কায়দা-কানুন প্রচলিত। সেসব আচার নিষ্ঠায় নারীকেই একনিষ্ঠ থাকতে হয় বেশি। ঐতিহ্যিকভাবে কুসংস্কার-মর্মমূলগত মানুষেরা এখানে পরিবার ও সমাজের রক্তচক্ষু প্রদর্শন-পূর্বক নারীকে অবদমিত ও বাধ্যগত করে রাখে। নারীর প্রতিভার অবমূল্যায়ন করে চূড়ান্তভাবে। এই বাস্তবতা মেনেই বাঙালি নারীকে জীবন-যাপন করতে হয়েছে। আধুনিক কালে যেখানে নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতার মতো শব্দগুলো সুপরিচিত হলেও দূরাগত, সেখানে বাংলাদেশের নারীরা যে-সকল সংকট-সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা গল্পে তুলে ধরেন গল্পকার। এই প্রক্রিয়ায় নারী অস্তিত্বের বিপুল পরিসর নিয়ে কাজ করেন শাহীন আখতার।

পেশাজীবী নারী

বাঙালি নারীমাত্রই পরিশ্রমী। সাহিত্য ও চিত্রকলায় নারীর যে ছবি আছে, তাতেও অবসরযাপন দেখা যায় না। অবসরযাপনের চিত্রে নারীকে সূচিকর্ম ও হস্তশিল্প প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। লোকগাথা, পালাগান, ব্রতকথায় গৃহী নারীর দক্ষ কর্মব্যস্ততার স্বরূপ দেখা যায়। শাহীন আখতারের ছোটগল্পের নারীরা প্রায় সকলেই পেশাজীবী এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'শাহীন আখতারের গল্পে থাকা অনেক নারী চরিত্রই পেশার সঙ্গে যুক্ত। তাদের পেশা সম্মান কিংবা অসম্মানের যাই হোক না কেন তারা কর্ম করে খায়। জীবিকা অর্জনের সঙ্গে নিজেরা যুক্ত।'[১১] অস্তিত্বরক্ষার দাবিতে খেটে-খাওয়া দরিদ্র নারীর রূপায়ণ আছে শাহীন আখতারের গল্পে। নারীর কর্মীসত্তাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ছোটগল্পে আলোকিত করেছেন শাহীন আখতার। স্বল্প-আয়ের নারীদের অনেক উদাহরণ আছে তাঁর গল্পে। প্রাচীন মূল্যবোধ অনুসারে 'সতী-নারী'কে কেবল শারীরিক শুদ্ধাচারেই যথেষ্ট হলে চলে না; তাঁকে কর্মদক্ষও হতে হয়। পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও প্রাধান্য অর্জন করার উপায় হিসেবে বাঙালি নারীকে হতে হয় অধিকতর দক্ষ। প্রাচীন সংস্কৃতিতে বাঙালি নারীর বিস্তৃত কর্মকুশলতা প্রমাণসিদ্ধ; যার দৃষ্টান্ত মেলে ছড়া, বচন, রূপকথা-উপকথা, ধাঁধা প্রভৃতি লৌকিক ও মৌখিক সাহিত্যে। নারী কেবল দৈহিক মানদণ্ডে শুদ্ধ হলেই সে সতী নয়, তাকে কর্মদক্ষও হতে হয়। সামাজিক স্বীকৃতি ও পরিবারের ভালোবাসা অর্জনের লক্ষ্যে নারীকে সতীলক্ষ্মীও হতে হয়। প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীর কর্মকুশলতার পরিচয় আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়:

> আদি সংস্কৃতিতে কোনো কাজই তুচ্ছ বা উচ্চ – এভাবে বিভক্ত ছিল না। নারী-পুরুষের কাজ ছিল প্রয়োজনমাফিক বিভক্ত যাকে division of labour বলা চলে। কিন্তু উৎপাদকর্ম থেকে নারী ক্রমে সরে যেতে থাকে, তাকে সরিয়ে দেয়া হতে থাকে। সে হয়ে পড়ে প্রান্তবাসী। ... নারীর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হলেই সংস্কৃতি বিচিত্ররূপে বিকশিত হতে পারে – উৎপাদন কাজে এবং শিল্পসাহিত্য জগতে – দুই ক্ষেত্রেই।[১২]

কৃষিসভ্যতায় নারীর সম্মানজনক অংশগ্রহণের ঐতিহ্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অনেকক্ষেত্রে বেহাল ও বেহাত হয়ে পড়ে। পরিবারে পুঁজি ও অর্থ জমা হয় প্রধানত পুরুষের হাতে। এবং এর মধ্য দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অতীতের চাইতে সীমাবদ্ধ হতে দেখা যায়। আদিম প্রকৃতিনির্ভর সংস্কৃতিতে নারী সমাজ-সংসারের কর্তৃত্বের ভূমিকায় থাকলেও পুঁজিবাদী সমাজে সে-অবস্থান থেকে বিচ্যুত। নাগরিকতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত থেকে পুঁজির পথযাত্রায় নারী প্রকৃতির মতো ব্যবহৃত ও নির্যাতিত হতে হতে ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নারীর ওপর পুরুষ-আধিপত্যকে

অনেকক্ষেত্রে দেখা হয় প্রকৃতির ওপর আগ্রাসন হিসেবেও। 'একালে মাতৃতন্ত্রের ক্ষমতা যখন পুরুষতন্ত্রের হাতে চলে গেছে, তখন, ভোগবাদী পুরুষতন্ত্র পুঁজিবাদী সংস্কৃতি নারী ও প্রকৃতিকে একইসঙ্গে নিজের অধস্তন ভাবতে শুরু করেছে। এবং শুধু অধস্তনই নয়, কখনও কখনও নিসর্গের প্রতি তার ইতিবাচক ভূমিকার ওপরও নির্বিচারে চালানো হয়েছে বর্বরোচিত আক্রমণ।'[১৩] বাংলাদেশের বাস্তবতার ক্ষেত্রেও এই শনাক্তি প্রযোজ্য। বাংলাদেশে অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও মিশ্রপুঁজির প্রভাবে গ্রামীণ নারীর কাজ অর্থনৈতিক মূল্য পায় না। অনেক ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত থাকা নারী অর্থমূল্য ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা – উভয়দিক থেকে বঞ্চিত হয়।

নারীর কর্মকে সেবার রূপ থেকে অবমুক্ত করে কর্মী-সত্তার পরিচয় চিহ্নিত করতে চান শাহীন আখতার। 'আস্তান' গল্পের বিন্দুবালা সৌন্দর্যপেশায় নিয়োজিত একজন কর্মী। বিন্দুবালা চরিত্রে গল্পকারের বিশ্লেষণী দক্ষতায় একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিধবা শ্রমজীবী কর্মনিষ্ঠ মায়ের বর্ণনা আছে। গল্পে বিন্দুবালার স্বগতোক্তিতে বাধ্য হয়ে সামাজিকভাবে অগ্রহণীয় পেশায় কাজ করার দুঃখবোধ প্রকাশিত হয়: 'দুঃখে দুঃখে জীবনডা গেল। একদিনের তরেও সুখ পাইলাম না। ... বিধবা মানুষ, মাছ-গোস খাই না, শরীর ঘাঁটাঘাঁটি করি, আল্লাহ মাফ করব – কষ্টের কামাইর পয়সায় একটা এতিম বাচ্চা বড় অইতাছে।'[১৪] বিন্দুবালার এই দুঃখবোধ কৈফিয়তের মতো শোনায়। গরিব-সর্বহারা বিন্দুবালা নিজের বহুস্তরিক নিরস্তিত্বের যাতনার প্রশান্তিরূপে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে। বিন্দুবালা একজন পেশাজীবী শ্রমিক নারীর প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। পেশাজীবী নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন লেখক। একই সঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির সামাজিক স্বীকৃতির জন্য ইতিবাচক মনোভঙ্গি তৈরি করেন। 'পুষ্পবাগ আবাসিক এলাকা' গল্পের কাহিনি আবর্তিত সৌন্দর্যপেশায় নিয়োজিত ম্যাসেজকর্মী নারী বাসন্তীকে কেন্দ্র করে। 'মেকআপ বাক্স' গল্পের পোশাক-শ্রমিক মল্লিকা, 'গল্পের গোলকধাঁধা' গল্পের শরাবন, 'প্রেততর্পণ' গল্পের নামহীন মেয়েটি, 'দিনের রূপসী' গল্পের নারীরা, 'ভার্জিন মেরির আত্মহত্যা' গল্পের মনোয়ারা বেগম ও তাহমিনা, 'মধুপূর্ণিমার রাত' গল্পের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মানসিক রোগগ্রস্ত ইসমত ও তার বন্ধুরা, 'হাতপাখা' গল্পের সাংবাদিক গল্পকথক – এরা প্রত্যেকেই কর্মজীবী নারীর প্রতিনিধিত্ব করে। নারীর প্রচলিত রূপনির্ভর ও আদর্শায়িত বিবরণকে শাহীন আখতার সচেতনভাবে এড়িয়ে নারীর নিজস্ব স্বর নির্মাণে নিবিষ্ট। নিম্নবিত্ত, মধ্য কিংবা উচ্চবিত্ত প্রতিটি অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবারেই নারীকে স্বকীয়তা ও মুক্তি অর্জনে সংগ্রামশীল থাকতে হয় যার বিবরণ পাওয়া যায় এসব ছোটগল্পে।

এদের মধ্যে অনেকেই রাজধানী ঢাকার শিক্ষিত ও নাগরিক অভিজাত পরিসরে বসবাস করে। 'শিস' গল্পের ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক মীরা, 'তাজমহল' গল্পের কলেজ শিক্ষিকা রোশনি, 'ঠান্ডা চা' গল্পের হোস্টেল সুপার রোজি, 'ইদ্দতকাল' গল্পে কর্মসফল কর্পোরেট চাকুরে মিনা – এরা প্রত্যেকে কর্মজীবী স্বাধীন শাহরিক নারী। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূত্রে জীবনযাপনের স্বাধীনতাকে অন্বেষণ করেছে তারা। তবে দুর্ভাগ্যজনক যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুরুষকে ক্ষমতাতান্তরের শীর্ষে স্থাপন করলেও নারীর ক্ষেত্রে তার ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। বহুপ্রথা-জর্জরিত বাঙালি সমাজকাঠামো নারীকে নানা জায়গা

থেকে দমিত করে রাখতে উদ্যোগী। শাহীন আখতারের ছোটগল্পে সামাজিক তুল্যমূল্য ও বিচারকাঠামো অনুপস্থিত থাকে; ব্যক্তি হিসেবে নারীর মানসিক ও মানবিক সংকট মুখ্যতা পায়। সমাজকে অস্বীকার করার প্রেষণা থেকে এখানে প্রচলিত সামাজিক সংকটের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর পেশাজীবী নারীকেও তাই অন্তর্গত বিভঙ্গভাবনায় প্রতিনিয়ত দীর্ণ হতে দেখা যায়। নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের বিকল্প নেই। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েই নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে পারে–এই সুচেতনাবোধ থেকে শাহীন আখতার তাঁর গল্পের নারীদের পেশাজীবী মানুষ হিসেবে সৃজন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণভাবে বাঁচতে চাওয়ায় জীবনের বাঁকে বাঁকে উপস্থিত লাঞ্ছনার মর্মবেদনা, নৈরাশ্য ও নৈঃসঙ্গ্যের বহুমাত্রিক বিবরণ প্রদান করেন শাহীন আখতার। ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে নারীর ব্যক্তিত্ব ও সংকটকে বাছাই করার পেছনে লেখকের নারীবাদী সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রকাশিত থাকে না। গল্পগুলোতে স্বাধীন মানুষ হিসেবে আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনে নারীকে সহযোগিতা করার প্রেষণা স্পষ্ট।

নারীর জন্য নারী

শাহীন আখতারের ছোটগল্পে নারীকথনের শিল্পভাষ্যে নারীর প্রতি সহমর্মিতাবোধের বর্ণনা আছে। নারীর প্রতি নারীর বিদ্বেষমূলক ও নিপীড়নমূলক আচরণের উদাহরণ সমাজ ও সাহিত্যে প্রচুর। বাংলা রূপকথা, ছড়া, ব্রতকথায় নারীর বিরুদ্ধে নারীর অবস্থান গ্রহণের চিত্র পাওয়া যায়। এতে করে বাংলা সাহিত্যে নারীর একটি প্রতীকী চিত্র চিহ্নিত হয়ে আছে, যেখানে মূল্যায়নের মানদণ্ডগুলো আগে থেকেই নির্ধারিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর ভেতরে বসবাসরত নারী ও পুরুষ উভয়ই পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতায়নের সৈনিক হিসেবে কাজ করে। নারী হিসেবে নিগৃহীতরাও নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা ছদ্মবেশে কাজ করে যায়। নারীর সীমিত ও পরিমিত অধিকার রক্ষার পুরুষ-আধিপত্যমূলক প্রচলিত বয়ানে ক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়াবাদী সামাজিক ধারণার বিপরীতে বিকল্প নারীবাদী নন্দন হিসেবে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নারীর শরীর ও জীবনঅভিজ্ঞতার নারীবাদী বয়ান প্রদান করে, যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে নারীর বিরুদ্ধে নারীর অবস্থানের বিপরীত ভাষ্য নির্মিত হয় এবং উচ্চকিত হয় নারীর প্রতি নারীর প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান। শাহীন আখতারের ছোটগল্পে দেখা যায় সংকটের পাঁকে আটকে পড়া নারীর প্রতি সহমর্মী হাত বাড়িয়ে দেয় অন্য কোনো এক নারী। নারী-সংহতি মেয়েদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একত্র করে এবং সমাজে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নারীর শ্রম, আবেগ অথবা শরীর ব্যবহৃত হওয়ার বিরুদ্ধে এটি কথা বলে; নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য এবং জেন্ডার-বৈষম্যের নানা প্রান্ত নিয়ে সোচ্চার হয়।

শাহীন আখতারের ছোটগল্পে একজন নারীর প্রতি সংহতি প্রকাশক দ্বিতীয় নারীটি কখনো বোন, মাতা, কন্যা, আত্মীয় অথবা বন্ধু, যার সঙ্গে মেলে তার অস্তিত্বের মূল স্বর। 'মেকআপ বাক্স' নারীর প্রতি নারীর মমত্ববোধের কাব্যময় বিবরণ। একটি সামান্য মেকআপ বাক্সের মোহে পড়ে দরিদ্র কিশোরী মালা গৃহ ত্যাগ করে এবং পরিপার্শ্বের নিবিড় ষড়যন্ত্রে দেহবৃত্তিতে যুক্ত হয়ে পড়ে। পাঁচ

বছরের মধ্যে খুন হয় সে। দেহবৃত্তি ব্যাপকভাবে নিন্দিত হলেও পেশা হিসেবে অবৈধ নয়। এর ভোক্তাসমাজ স্বীকৃতি পায়, অথচ সকল ঘৃণা ও অসম্মানের অধিকারী হয় নারীদেহশ্রমিক। সমাজের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয় মালার খুন হওয়া নিয়ে লেখক স্বল্পবাক থাকেন। মালার বড়বোন পেশায় পোশাকশ্রমিক মল্লিকার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে গল্পটি বর্ণিত। লেখক মল্লিকার শোকবিহ্বল মর্মবেদনা বর্ষার প্রকৃতির মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে– 'বেশ্যার কবর হয় না–মল্লিকা তা জানতো না'। অস্তিত্বচেতনার নির্জ্জান স্তরে ভগিনীত্ববোধের তাড়না ও মর্মপীড়া অনুভব করেছে সে। পাঁচ বছর যে বোনের সঙ্গে দেখা হয়নি, যোগাযোগ হয়নি, মৃত্যুর পর কল্পিত সংলাপে, স্মৃতিকথায় আর মনোলগে সেই বোনের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মৃতা পতিতার কবর নিয়ে সমাজের লোকের ভীষণ বিরূপতার মধ্যেই সেই মৃতা বোনের সৎকারের দায়িত্ব নেয় মল্লিকা। নিজের দরিদ্র সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে বোনের মানবিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে থাকা মল্লিকা এক সহমর্মী ও সমানুভূতিশীল মানুষ:

> মল্লিকা নিজেও আর বুঝতে পারে না, এই লম্বা পথ বেহেশত না দোযখে যাওয়ার। হাতে ধরা যে লণ্ঠন, একসময় এর তেল ফুরিয়ে আসে। সে তবুও নিশাচরের মতো রাতের অন্ধকারে বোনের লাশ বয়ে নিয়ে যায় এক কবরস্থান থেকে আরেক কবরস্থানে।[১৫]

দরিদ্র ও সমাজচ্যুত মৃত বোনের প্রতি মল্লিকার মমত্ব ও অধিকারবোধ নারীর প্রতি নারীর সংহতি প্রকাশের উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নিম্ন-আয়ের মানুষের অলিখিত ইতিহাসকে ছোটগল্পে রূপদান করেন শাহীন আখতার। এক নারীর শারীরিক অসুস্থতাজনিত নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও মানসিক রোগের সিজোফ্রেনিক অবস্থার মধ্যে বোনের সঙ্গে কাল্পনিক দেখা-সাক্ষাৎ নিয়ে গল্প 'বোনের সঙ্গে অমরলোকে'। অত্যন্ত অসুস্থ নারীটির মৃত্যুচেতনা যখন প্রতিনিয়ত তার জীবনীশক্তিকে আরও কমিয়ে আনছে, তখন কাছের মানুষ বা একান্ত আপনজন রূপে ছোটবোনের আগমন ঘটে। জীবন ও মৃত্যু যখন সূত্রবদ্ধ গণিতের মতো, তখন অবাস্তবের বর্ণনা গল্পের শিল্পকাঠামো নির্মাণ করে। এখানে নারীর জীবন সংকটের অন্ধকারে বলয়িত। একের মৃত্যুও যখন অপরদের কাছে মূল্যহীন, তখন নিস্পৃহতা, বৈরাগ্য ও নৈরাশ্যই হয়ে ওঠে ব্যক্তি-নারীর মৃত্যুদর্শনের স্বরূপ। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত নারীর কফিনাকৃতির আয়তকার ঘরে ছোটবোনের অলৌকিক আবির্ভাব ঘটে। যে মৃত্যুর অপেক্ষায় নারীটির জীবন বিষিয়ে উঠেছিল, ছোটবোন স্বভাবসুলভ দুর্বিনীতপনায় সেই মৃত্যুকেই ভুলিয়ে রাখতে পারে:

> আমার মৃত্যু-ভাবনার পাশ কাটিয়ে, আলগোছে পা ফেলে আমার বোন চুলার কাছটায় চলে যায়। চাল-ডালের কৌটো, মশলার ডিব্বা নেড়েচেড়ে খানিক বাদে খিচুড়ি বসায়। আমি নাক-মুখ বালিশে গুঁজে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকি। এ কী আপদ! আমাকে আমার মতো থাকতে দেবে না দেখছি।[১৬]

পরিবার ও দাম্পত্য থেকে পরিত্যক্ত, সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কল্পিত বোনকে আশ্রয় করে একটু স্বস্তিতে মরতে চেয়েছে মল্লিকা। কল্পিত বোনের সঙ্গে নিজের নিবিড় দুঃখের আলাপ করতে পারে মৃত্যুপথযাত্রী বোন। নিজের রোগগ্রস্ততার গভীরে থাকা নিরস্তিত্বের যাতনা ভাগ করে নিতে পারে। বোনের শ্লেষাত্মক প্রশ্নের ভাষায় জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার হিসাবে বসে তার মনে হয়: 'আমরা মৃত্যুময় স্থবির পারিপার্শ্বিক বদলাতে, ডাক্তাররা যা করতে পারেনি,

আমার বোন তা পেরেছে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে অমরলোকের উদ্দেশে ও বেহুলার ভেলা ভাসিয়েছে।'[১৭] মনসামঙ্গলের বেহুলাও এক স্বতন্ত্র-সাহসী নারী, যে হতাশা ও মৃত্যুর বিপ্রতীপে আশার ভেলা ভাসিয়েছিল। গল্পে নৈঃসঙ্গ্য-আক্রান্ত বিপন্ন নারী অবচেতনে খুঁজে নিয়েছে অন্য এক নারীর সাহচর্যপূর্ণ আশাবাদ, যার বাস্তব ভিত্তি নেই। গল্পের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত হয় অমরলোকে যার পিছনে সে যাত্রা করছে, স্নেহের ছোটবোনের রূপধারী সত্তাটি কথক নিজেই। এই আবিষ্কার তার অলঙ্ঘনীয় মৃত্যুযাত্রার শেষচিহ্ন। সমাপ্তিতে এই প্রশ্ন থেকে যায়, একা একা স্বাধীনভাবে যে নারী থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে কতটা স্বাধীন। স্বাধীনতার সামাজিক অস্বীকৃতি যন্ত্রণা দেয় নারীটিকে। স্বাধীনতার আনন্দের চেয়ে গল্পে বড় হয়ে দেখা দেয় নিঃসঙ্গ মানুষের মর্মযাতনা। ছোটবোনের কণ্ঠস্বর কখনো স্নেহময়, কখনো সমাজের কর্কশ কণ্ঠ হয়ে নারীটির সতীত্ব ও নৈতিকতার বিষয় নিয়ে কথা বলে; কখনো তার অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আলোচনা করে নারীটির জটিল যাপিত জীবনঅভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মনোলৌকিক অপ্রকৃতিস্থতার বাহক হয়। ভিন্ন ধর্মের একজনকে বিয়ে করায় সে পরিবারে ও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। বিড়ম্বনাপূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্কটি ভেঙে গেলে প্রবল একাকিত্ব ও আত্মিক বিপন্নতার মধ্যে দিয়ে অসুস্থতার ক্রমমৃত্যুময় পথে যাত্রা করেছে সে। জীবনের আশা কেউ ত্যাগ করতে চায় না, কল্পিত বোনের প্রথম সংলাপ থাকে – 'আসলাম। আমি বাঁচতে চাই আপা!' মৃত্যু ও বেঁচে থাকার পরস্পর বিপরীত স্রোতে নারী আকাঙ্ক্ষা করেছে এক সহমর্মী স্বজন। অমূলক প্রত্যক্ষণ ও বিভ্রমের (Illusion) মধ্য দিয়ে বিপন্ন ও বিষণ্ন মানুষের শেষ পরিণতিকে এক পরাবাস্তব আবহপূর্ণ শিল্পসৃষ্টির ছাঁচে নির্মাণ করেছেন গল্পকার। 'ভার্জিন মেরির আত্মহত্যা' গল্পে নারীর প্রতি নারীর সহমর্মী অবস্থানে থেকে অন্যদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মেয়েদের প্রতি সম্পৃক্তি প্রকাশ করে ক্রমশ নিরস্তিত্বের পথে যাত্রা করে তাহমিনা। পেশায় তাহমিনা একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তার কাছে একাউন্ট করতে আসা ডলির অবদমিত জীবনের দুঃখকষ্টের প্রতি তার সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। স্বহননের মধ্যে দিয়ে নারীর প্রতি বিরূপ বিশ্বকে ডলির মতোই প্রত্যাখান করে তাহমিনা। নারীর অস্তিত্বের গল্পগুলো এভাবেই শাহীন আখতারের লেখায় নারীবাদী সাহিত্যের চেয়েও বেশি কিছু সংকটাপন্ন বিবরণ প্রদান করে। ডলির মৃত্যু হলে এক প্রচণ্ড নিরস্তিত্ববোধ তাহমিনার অস্তিত্বকে সংকটিত করে তোলে। এই বিপন্নতাবোধের উৎস কেবল ডলির আত্মহনন নয়; বরং নিঃসঙ্গতা এবং সামাজিক অধিকারহীনতার জীবনযাপনের প্রতি শ্লেষাত্মক অস্বীকৃতি।

নিজ শরীর: নারীর অধিকার

শরীরের ওপর নারীর আত্মঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির প্রশ্নটি এখন আর নতুন নয়। নিজ শরীর কিশোরী-তরুণীর কাছে যেন একটি নিষিদ্ধ বস্তু, যা নিয়ে কথা বলা বাঙালি সমাজে এক প্রকার ট্যাবু। সতীত্বই তার আত্মমর্যাদার প্রধান মানদণ্ড – এরূপ ধারণা মেয়েদের জন্য তৈরি করা আছে। নারীর শরীরী দাবির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয়ে নারীর নীরব থাকাই যেন নিয়ম। প্রণয় ও নারীদেহ নানাভাবে এলেও বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে অনালোকিত। পুরুষ-লেখকের অভিজ্ঞতার স্থান থেকেই বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। নারী-শরীরের ওপর পুরুষাধিপত্য,

সন্তান-জন্মদান প্রক্রিয়ায় নারীর ব্যক্তিগত আগ্রহ-অনাগ্রহের চেয়ে পারিবারিক ঔচিত্যবোধ ও সামাজিকভাবে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি সাহিত্যে। নারীবাদী সাহিত্য সমাজের জন্য জরুরি কী না – এই প্রশ্নটির উত্তর সচেতন পাঠক পেয়ে যায় শাহীন আখতারের গল্পে। এ প্রসঙ্গে একটি অভিমত :

> নারীবাদ অবশ্যই মানবাধিকারের একটা অংশ। কিন্তু মানবাধিকারের মতো অস্পষ্ট একটা শব্দ ব্যবহার করলে লিঙ্গের যে নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র অসঙ্গতি রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করা হয়।[১৮]

শাহীন আখতারের ছোটগল্পে নারী তার নিজ শরীরের অধিকারী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত। গল্পের অধিকাংশ নারী শরীরী বিষয়ে ট্যাবুমুক্ত, কেউ-বা বিবাহপূর্ব অথবা বিবাহবহির্ভূত শরীরী সংযোগে অভ্যস্ত, প্রথাগত বৈবাহিক সম্পর্কে আস্থাহীন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সমকামিতামূলক সম্পর্কে আস্থাশীল। সামাজিক দূরত্ববোধ-আক্রান্ত নৈঃসঙ্গ্যজাত বিবিক্তি আধুনিক মানুষের জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। নাগরিক নারীদের শরীরী চিন্তায় একাকিত্ববোধটিই প্রধান।

'ইদ্দতকাল' গল্পে মিনা ও সাদেক বিবাহবিচ্ছেদপ্রার্থী দম্পতি। 'ইদ্দত' কেবল নারীর জন্য পালনীয় একটি ধর্মীয় বিধি, যেখানে বিচ্ছেদের পর নারীকে তার সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য এবং গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার জন্য তিন থেকে চার মাস অপেক্ষা করতে হয়। গল্পে মিনা বড় চাকরি করে ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে ধাবমান হলেও অর্থনৈতিক মুক্তি তার জন্য নিশ্চিন্ত জীবন নিশ্চিত করতে পারে না। মিনার স্বামী সাদেক স্বস্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাকাতর ও সন্দেহ-পরায়ণ পুরুষ। স্ত্রীর চরিত্রে কালিমা লেপনে সর্বদা সচেষ্ট ব্যক্তি অনায়াসে সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। গল্প থেকে উদাহরণ: 'সাদেক যে আরেকটা বিয়ে করতে চায়, তার জন্য তো মুখ খারাপ করার দরকার নাই। বউয়ের বাচ্চা হয় না, এ-ই তো যথেষ্ট। কাজি-উকিল সব পক্ষে থাকবে।'[১৯] সাদেকের মতো কিছু পুরুষ চরিত্র লেখকের বিভিন্ন গল্পে আছে। এই পুরুষ চরিত্ররা অনেক ক্ষেত্রেই অসংবেদনশীল, যান্ত্রিক, অনুভূতিশূন্য; মূলত টাইপ চরিত্র হিসেবে চিত্রিত। কপট ও স্বেচ্ছাচারী সাদেকের বিষাক্ত সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চায় মিনা নিজেও। কারণ শারীরিক অসামর্থ্যের দোহাই দিয়ে নিঃসন্তান থেকে যাওয়ার দায়ভার ভিত্তিহীনভাবে মিনার ওপরই চাপানো হয়। ভগ্ন হৃদয় মিনা ইদ্দত পালনকালে বন্ধু সবিতার অনুরোধে নিজের অসুখী দাম্পত্যের ক্ষত শুকাতে শিলং বেড়াতে যায়। শিলং তার কাছে *শেষের কবিতা* উপন্যাস বা *মেঘে ঢাকা তারা* সিনেমার স্মৃতিতে নস্টালজিক। স্বামীর মূল্যায়নে 'মিনার চরিত্র নাই'। স্বার্থপর স্বামী-কর্তৃক অসম্মানিত ও উপেক্ষিত মিনা নিজের শরীরের জমিনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সচেতনভাবে সুবিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সতীত্বের কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই। বিপর্যস্ত হলেও মিনা সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিজ ভবিষ্যৎ অন্বেষণ করে। সতীত্বের সামাজিকতাকে অস্বীকার করে নিজ শরীরের সম্ভাবনাকে মূল্যায়ন করে। গল্পকারের প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ:

> লাবণ্য হওয়া মিনার পোষাবে না। সেই উচ্চ আদর্শের যুগ শেষ, যখন মেয়েরা নভেলের মডেল-কন্যার মতো নিজেদের সাজাতো – সুচারু, বিবেকবান, ঘরোয়া আবার জিদ্দি। ভাঙবে তবু মচকাবে না। *মেঘে ঢাকা তারার* নীতার মতো সর্বস্বত্যাগী মেয়েও সে নয়। নিজের জন্য আরাম-আয়েশ, সুখ-বিলাস কিছু-না-কিছু থাকা চাই। অন্যের করুণা নয়, মিনা চায় মর্যাদা।[২০]

নিজ শরীরের ওপর আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করে নিজেকে সম্মানিত করেছে মিনা। শিলংয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে মিনার সংস্কারমুক্ত সিদ্ধান্তকে বেমানান মনে হয় না; বরং *শেষের কবিতা* আর *মেঘে ঢাকা তারা*র রেফারেন্সে মিনা চরিত্র বাংলা সাহিত্যের নারীবিশ্বে এক নবতর মাত্রার সংযোজন ঘটায়। গল্পের সমাপ্তি পর্যায়ে দেখা যায় অনাগত সন্তানকে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করছে মিনা। স্বামীর অপবাদ ও সমাজের দেওয়া ইদ্দতকে প্রত্যাখান করে, গর্ভধারণের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম মিনা পুরুষতান্ত্রিক ঘূর্ণাবর্ত অতিক্রমকারী এক প্রাগ্রসর নারী হিসেবে চিহ্নিত হয়।

'তাজমহল' রোশনির গল্প। দাম্পত্য-শ্রদ্ধায় অতন্দ্র রোশনি বিধবা হলে যথারীতি তার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। বিধবা নারী বাঁধা-ধরা সামাজিকতার বাইরে গেলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তা কোনোভাবেই মেনে নেয় না; নৈতিকতার প্রশ্নে নিয়ত বিদ্ধ করে। একাকী নারীর বেঁচে থাকার সংগ্রামশীলতাকে ব্যাখ্যা করেছেন গল্পকার। মনঃপীড়া ভুলে বিস্তৃত শোক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রোশনি তাজমহল ভ্রমণ করে; গান ও নাচের অনুশীলন, যোগব্যায়াম এবং কর্মজীবন নিয়ে বাঁচতে চায় নিজের মতো করে। 'এভাবে রাতদিন মরা মানুষ নিয়ে পড়ে থাকা – আমি যেন শিমুলগাছে গা ঘষে ঘষে নিজেকে রক্তাক্তই করেছি।' – এই বোধ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সে। শিক্ষিত, স্বনির্ভর কলেজ শিক্ষক রোশনির অর্থনৈতিক মুক্তি তার জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানে যথেষ্ট হয় না। অর্থলোভী শ্বশুরপক্ষের ষড়যন্ত্রে বিষযুক্ত পানিপানে মৃত্যু হয় তার। গল্পে ক্লাইম্যাক্স হিসেবে দেখা যায় মৃত্যুকালে রোশনির গৃহে ঘটনাচক্রে উপস্থিত পুরুষ-সহকর্মীও মারা যায় রোশনির সঙ্গে। ফলে সমাজের চোখে রোশনির পতিপ্রেমের সাক্ষ্য প্রমাণিত হওয়ার সুযোগ পায় না। বরং বিধবা নারী চরিত্রহীনা ছিল, সেই সামাজিক ধারণাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবে নারীর কোনো তাজমহল নেই। বিধবা নিঃসন্তান নারীর অন্তর্বাস্তব জগৎ উন্মোচন করে লেখক দেখিয়েছেন মানব-অস্তিত্বের কাছে সামাজিকতা কতটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়। এ গল্পে রয়েছে নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতার প্রসঙ্গ। গৃহস্থালি বা পারিবারিক সহিংসতা একটি ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি, যার ভেতরে কার্যকর থাকে বিপর্যস্ত সামাজিক মনস্তত্ত্ব। একটি সমাজে পারিবারিক সহিংসতার অসুস্থ চর্চার দীর্ঘ আর্থরাজনৈতিক পটভূমি থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একজন সমাজ-গবেষকের অভিমত:

> No matter how pernicious or pervasive domestic violence has been around the world, we have not been able to deal with it – neither as a crime, nor as a psychological disorder. Even less have we addressed it as a consequence of economic and political imbalance. We recognise that this manifestation of power is tolerated by social and political norms. But we have yet to make a connect between the methods used to control women's freedom and choice and the family economy.[২১]

পারিবারিক সহিংসতার কারণ যা-ই হোক, একে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও সমাজরীতিতে এর প্রতিকার এখনও সহজ নয়। একই ধারার আরেকটি গল্প 'ভার্জিন মেরির আত্মহত্যা'। গল্পের ঘটনাংশে প্রবাসী তরুণী ডলিকে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়: 'বারোতলা থেকে পড়ে ডলির মৃত্যু হয়েছে এবং সে ভার্জিন ছিল।' ডলির অবমাননাকে নারীত্বের অমর্যাদা হিসেবে স্পষ্ট করেন লেখক। স্বামীর অপরসম্পর্ক, অপবাক্য, অবহেলা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় অনিশ্চিত জীবনের প্রতি আগ্রহ হারায় সে।

গল্পকারের সহমর্মী বর্ণনায়: 'নারীত্বের অবমাননা দিনে দিনে ছাদের তারে মেলা রঙিন শাড়ির মতো ফুলে উঠতে শুরু করে। যদিও সে চোখের সামনের শাড়িগুলোর বাতাসে ফুলে ওঠা তাকিয়ে থেকেও দেখতে পায় না। সে শুধু বঙ্গোপসাগরের নিঃসীম ধু ধু জল দেখে।'[২২] স্বামীর কাছে অনাকর্ষণীয় হওয়ার নিত্যতায় ডলি গভীর সংকটময় মনঃপীড়ার পরিবেশে ক্রমপ্রবেশ করে সে। 'সে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতা দেহের ভাঁজে ভাঁজে লুকোতে চাইছিল, যাতে নিজের দেহের ভেতর আশ্রয় দিতে পারে স্বামী পরিত্যক্ত দেহটাকে।'[২৩] ক্রমশ আত্মহননের অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। মূলত, পরিত্যক্ত হওয়ার অনুভূতি থেকেই আত্মহননের পথকে বেছে নেয় ডলি। বঙ্গীয় সমাজে নারীর যৌনতাকে ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া হয়। একই সঙ্গে এই বিষয়ে মৌন থাকার অলিখিত নিয়ম নারীর মগজে ছাপানো থাকে। গল্পে ডলি প্রশ্ন করে, সমাধান পাবে না জেনে নীরব থাকে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পুরুষাধিপত্য নারীর শরীরের ওপর সর্বদা নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে চায়। ডলির মৃতদেহ মায়ের কাছে ফিরে এলে পরিবার ও সমাজের অন্যান্য মানুষ ডলির মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে করে এবং নিঃসন্তান নারীর আত্মহননকে ন্যায্যতা দানের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। একইসঙ্গে তারা স্বামী রুস্তমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় নিষ্ক্রিয় থাকে এবং সক্রিয় থাকে নারীর চারিত্রিক শুদ্ধতা বিষয়ক মুখর আলোচনায়। ডলির মা মনোয়ারার সন্তান শোককে একমাত্র অনুভব করে অনাত্মীয় অপরিচিত তাহমিনা। তাহমিনা নিঃসন্তান এবং তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। সমাজের চোখে সেও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। তাই বিদ্যালয়ের অবোধ বালকের মুখে প্রশ্ন তুলে দেন লেখক, 'এই আপনের বাচ্চা হয় না ক্যান, আপনে কি আত্মহত্যা করবেন?' এই স্কুলের অবোধ বালকেরা বোধহীন বা সংবেদনহীন পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি। সামাজিক শৃঙ্খলে নারীর প্রজনন সক্ষমতাকে আবদ্ধ করে নারীকেই আবার প্রশ্ন করা হয়। উক্তিটি পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে বালকদলের মুখে স্থাপন করে নারীর শেষ না হওয়া জবাবদিহির পৌনঃপুনিক অবমাননাকে শিল্পরূপ দেন শাহীন আখতার। বালকের মুখের প্রশ্ন জনদাবিতে পরিণত হয়ে তাহমিনাকে ডলির মতো আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। ব্যাংক কর্মকর্তা তাহমিনা এভাবে অস্তিত্বহীনতার নিম্নগ্রামে পৌঁছে গিয়ে স্বহননে উদ্যোগী হয়ে আত্মসংকট মীমাংসার পথ খুঁজে নিয়েছে। শরীরের ওপর অধিকারহীনতা থেকে নারীর এ আত্মবিনাশী যাত্রাকে মরমি দৃষ্টিতে দেখেছেন গল্পকার। সামাজিক নিয়মাচারের প্রতিবাদ এই গল্পের মূল উপজীব্য। পুরোনো নীতিবিচারে অভ্যস্ত, কর্তৃত্বপরায়ণ, স্বার্থপরায়ণ এবং আক্রমণাত্মক সমাজব্যবস্থাই নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া সহিংসতার জন্য দায়ী থাকে। পরিবারকাঠামোর ভেতরে প্রতিনিয়ত নারী নিষ্পেষিত হয়, যা প্রতিকারহীন:

> Although women's sexuality has in many ways been liberated from patriarchy's control, in many ways it has not. One does not have to look far to run across the practice of clitoridectomy; rejection of lesbians; rape; women-beating; incest; nonconsensual participation in the socalled sex-industry; problems in women's gaining access to contraception, abortion, and even proper sex education; purdah, nonconsensual veilings, arranged marriages for monetary and/or status reasons; restrictions on midwives; downgrading of women-directed art and music; illiteracy; paucity of women in science, technology, engineering, math, and other [lucrative] male professions; and so forth. Men are not necessarily conspiring with one another to keep women down, but the power of the institution of compulsory heterosexuality, and certainly of unreflective heterosexuality, persists.[২৪]

নারীর জৈবিক সত্তা

নারীর স্তন, জরায়ু, ডিম্বাশয় নারীর জৈবিক সত্তা ও অস্তিত্বের পরিচায়ক। আধুনিক বিশ্বে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় জীবন বাঁচাতে অঙ্গহানির মতো বিষয়গুলোও যুক্ত হয়েছে সমকাললগ্ন নারীর অভিজ্ঞতায়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যে নারীর অঙ্গহানি ঘটে, তার মনোদৈহিক পরিস্থিতি শাহীন আখতারের ছোটগল্পে বিষয় হিসেবে এসেছে। এ ধারায় একটি সবিশেষ গল্প 'মিসেস চৌধুরীর পুনর্জন্ম'। এ গল্পে নারীর শরীর ও মনের জটিল অভিযাত্রার বিচিত্র ইতিহাস নির্মিত হয়েছে। কন্যাশিশুর নারী হয়ে ওঠা থেকে শুরু করে অঙ্গহানির মধ্য দিয়ে নারীত্বের শরীরী অবসানের এক বিস্তৃত জগৎকে গল্পকার অনবদ্য শিল্পযোগে উপস্থিত করেন; নারীর প্রজনন-প্রত্যঙ্গসমূহকে জবাফুলের প্রতীকে উপস্থাপন করেন, যে জবাফুলটিকে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিসেস চৌধুরী প্রতিনিয়ত আত্মসত্তায় উপলব্ধি করেন নিজের যৌবন ও নারীত্বের শক্তিমত্তার জায়গা হিসেবে। মিসেস চৌধুরী নামহীনা একজন নারী – নামকরণের মধ্যে আছে অনেকটা পুরুষ-সাপেক্ষতা। এ চরিত্রে দেখা যায় – কিশোরী বয়সের দেহবিকাশের পাশাপাশি আকর্ষণ ও প্রেমবোধের জন্ম, অসমবয়সী ব্যক্তির সঙ্গে জীবনযাপন-চিত্র। দাম্পত্য জীবনের অপ্রাপ্তি, শরীরী কামনার অপূর্ণতা, অসুস্থতাজনিত অঙ্গহানি, দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর অমর্যাদা – এ সকল কিছুর মধ্য দিয়ে নারীর শরীরী অচরিতার্থতার একটি আনুপূর্বিক বিবরণ ভাষারূপ লাভ করেছে। অন্যদিকে জনাব চৌধুরী প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক নৈতিকতার যথার্থ দৃষ্টান্ত। এই গল্পে স্বামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে পুরুষতন্ত্রের উপস্থিতি ঘটে নারীবাদী বয়ানের অধীনে। স্ত্রীর শরীরকে 'শস্যক্ষেত্র' ধরে নিয়ে 'চাষবাস' নিয়েই ব্যস্ত থাকে শাসক স্বামী। বঙ্গীয় সমাজে এরূপ দাম্পত্যের উদাহরণ অপ্রতুল নয়। আত্মমর্যাদাহীন পরাধীনতার মধ্যে অস্তিত্বের অভ্যন্তরে বিরূপ বহির্জগতের এক বিকল্প স্বীয় শরীরী জগৎ তৈরি করে রাখে মিসেস চৌধুরী; নিজ নারীত্বের প্রতীক জবাফুলটিকে নিয়মিত সতেজ রাখে। কৈশোরক প্রেমের স্মৃতিকাতরতা এই জবাফুলের প্রতীকে উপস্থাপিত। নারীর শরীর ও নারীর অস্তিত্বের এই সম্মিলিত অভিযাত্রার শিল্পবয়ান নির্মাণ করেন গল্পকার:

> জবা ফুল রঙিন পাপড়ি মেলল। শরীরের অতল অন্ধকারে মিসেস চৌধুরী অনুভব করেন তার মৃদু শিহরণ। মাসে মাসে শরীর-নির্গত রক্তস্রোত, লাল-ফুলটির তরল নির্যাস যেন। তারপর আবার নতুন করে ফোটে সে ফুল। কী এক সুখকর ব্যথায় বুক টনটন করে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কি দুপুরের একাকিত্বে অথবা জ্যোৎস্না-ভাসা রাতে তলপেটে হাত রাখলে সুহৃদ চক্রবর্তী এসে হাজির হন। মাথায় টোপর। মুখমণ্ডল চন্দন-চর্চিত। তাঁর ফিনফিনে ধুতির খুঁটে মিসেস চৌধুরীর লাল বেনারসির আঁচল শক্ত করে বাঁধা। থেকে থেকে নেপথ্যে উলুধ্বনি ওঠে। তাঁরা তখন সাত পাকে ঘুরে ঘুরে একসঙ্গে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। মিসেস চৌধুরী সামনে, সুহৃদ চক্রবর্তী পেছনে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কখন তাঁর বিয়ে হয়ে গেল একজন রাশভারি অধ্যাপকের সঙ্গে, তিনি টেরও পেলেন না। সুহৃদ চক্রবর্তীর স্মৃতি জবা ফুলের মাঝে বেঁচে রইল তার পরের চব্বিশটা বছর – হায় দু-দুটি যুগ।[২৫]

এখানে নারীর নিজস্ব স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতার ভাষ্য নির্মিত হয়েছে তারই নিজস্ব অস্তিত্ববোধ ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সম্পৃক্তিতে। এই ভাষ্য সরল নারীবাদী ভাষ্য। নারীবাদী টেক্সট কেবল নারীদের গল্প বা কাহিনি নিয়ে কাজ করে না; বরং নারী-জীবনকে স্পষ্টভাবে সাহিত্যে তুলে ধরে নারীর জীবনকাঠামোর সমস্যা ও সৌন্দর্যের স্বীকৃতি দেওয়া এর মৌল প্রতিপাদ্য। উপরন্তু নারীর অবস্থার বিশেষ বিশেষ দিককে আলোকিত ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করে। কখনো কখনো

নারীর অবস্থার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে বক্তব্য প্রদান করে। সর্বোপরি, নারীজাতির সামগ্রিক স্বার্থে একটি সাহসী রাজনৈতিক বয়ান নির্মাণ করে। প্রজননতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হলে মিসেস চৌধুরীর স্বামী প্ররোচনা ও তিরস্কার করে স্ত্রীর প্রজনন-প্রত্যঙ্গগুলো অপসারণ করায়। নিজের বয়োবৃদ্ধতার কাছে স্ত্রীর তরুণ দেহের সক্ষমতাকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখে সে। 'এ বয়সে একজন নিরস্ত্র সঙ্গীই নিরাপদ, সাপুড়ের ঝাঁপির বিষদাঁতহীন পোষা সাপ যেমন। স্ত্রীর প্রজনন-অঙ্গের তাঁর আর দরকার কী। যখন ছিল, তা থেকে তো প্রয়োজনমতো শস্য তিনি গোলায় তুলেছেনই। এখন এটি একটি বাড়তি ঝঞ্ঝাট।'[২৬] নারীর প্রজননসক্ষমতা পিতৃতন্ত্রের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাতে মিসেস চৌধুরীর শরীরকেন্দ্রিক নিজস্ব দুনিয়া ভেঙে পড়লে মিসেস চৌধুরীর মনের দরজা-জানালায় অন্ধকার ভিড় জমায়। অঙ্গহানির প্রাত্যহিক মনোদৈহিক যাতনায় নারীপ্রত্যঙ্গহীন দেহটিকে তার কাছে কারাগার মনে হয়:

> ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট – তা তাঁর হয়েছেও। এখন ওরা উড়ছে। উনি পক্ষীমাতা। ফের ডিম পাড়ার, তা দেয়ার পর্বও শেষ। তাঁর পালক ঝরে গেছে। দিনভর শূন্য খাঁচা আক্রোশের নখ দিয়ে আঁচড়ান। ... পুষ্পে-পত্রে যে শরীর একদিন পল্লবিত হয়েছিল, তার কোনো চিহ্নই আর থাকবে না। তারপর তিনি বেঁচে রইবেন – কতদিন, কতকাল, শরীর থেকেও নেই, এরকমভাবে![২৭]

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট তার জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে অস্তিত্বের ভিত নাড়িয়ে দেয়। অসহায় কল্পনায় নিজ শরীর মন্থন করে মনে মনে জবাফুল তৈরি করেন। মিসেস চৌধুরীর নবযৌবনের কল্পিত পুনর্জন্ম হয়। বহু নারী তাদের হৃত দেহ ও লুণ্ঠিত আবেগ নিয়ে এরূপ পুনর্জন্মের স্বপ্ন দেখেন। নারীর শরীর ও মনের পরিস্থিতিকে শৈল্পিক সুন্দরতায় ছোটগাল্পিক পরিসরে উপস্থাপন করেছেন শাহীন আখতার।

'জরায়ুগাথা' গল্পে জরায়ুহীন নারীর নিরস্তিত্ববোধ প্রকাশিত। প্রজননতন্ত্রহীন নারী বলে: 'এখন থেকে জরায়ু নেই। জরায়ুর স্বাধীনতাও তাহলে আর নেই!' – এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে দুটি প্রশ্ন থেকে যায় – এক, জরায়ু নারীর জন্য শৃঙ্খল কিনা; অন্যদিকে, জরায়ুমুক্ত নারীর অভিজ্ঞতা কি ভালো নাকি খারাপ? গল্প থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> জ্যা-মুক্ত তীরের মতো আমি কেবল শূন্যে উড়ছি। শূন্য থেকে শূন্যতায়। এই অপার শূন্যতা, এই আলো-আঁধারি পারিপার্শ্বিক ছাড়িয়ে এবার ভোঁকাট্টা ঘুড়ির মতো পাক খাচ্ছি, এলোপাতাড়ি উড়ছি-নামছি। কখন কোথায় পড়ব, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।[২৮]

জরায়ুহীনতা আর অস্তিত্বহীনতার উপায়হীনতা একীকৃত হয়ে আছে এই উদ্ধৃতাংশে। জরায়ুহীন নারীর জীবনের চিত্রকল্প হিসেবে এসেছে 'অসংখ্য গর্ত আর ছ্যাঁদার মস্তবড় এক ছেঁড়া জাল আমার জীবন' – উপমাটি। নারীকে সমাজ যখন কেবল লৈঙ্গিক পরিচয় দিয়েই পরিচিত করাতে চায়, তখন সেই একান্ত পরিচয়টি হারিয়ে নারীর যে উন্মূল দশা তৈরি হয়, তা মর্মান্তিক। প্রজনন-প্রত্যঙ্গহীন নারী উনমানুষ হওয়ার ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকে। পরিবার ও সমাজ থেকে প্রাপ্ত এই ধারণা পুরুষতান্ত্রিক। নিজেকে নারী জেনে ও মেনে নিয়ে যে নারী জীবনকে বুঝে নেয়, নারী প্রত্যঙ্গহীনতা তার ভেতর যে শূন্যতাবোধ তৈরি করে, তার ভাষ্য 'জরায়ুগাথা' গল্প:

> 'শোনো আয়া! কত নপুংসক এ পৃথিবীতে সম্রাটের মতো বেঁচে আছে জানো? জানো না। আমি জানি। তারা সাপুড়ের সাপ নাচানোর মতো মেয়ে নাচায়। মেয়েরাও রাত নাই, দিন নাই তাদের দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। আহা, পুরুষ যে। আর পৃথিবী নামের গ্রহটি তো তাদেরই।'[২৯]

এই অংশে উদ্ধৃত আক্ষেপ সম্ভবত বিমানবিকীকরণের বেদনা থেকেই উৎসারিত।

নারী-সমকাম

নারীর অবদমিত পৃথিবীকে উন্মোচন করেছেন শাহীন আখতার তাঁর ছোটগল্পে। পুরুষশাসিত সমাজে অবদমন নারীর অপর নাম। অবদমনের সঙ্গে নারী-সমকাম প্রসঙ্গটি জড়িত। নারীর জীবনের নানামাত্রিক অবদমনের ইতিবৃত্ত উন্মোচন করেন শাহীন আখতার। নারীর মনোবিশ্বকে বাংলা ছোটগল্পের পাঠকের কাছে তুলে ধরেন তিনি। গল্পকার নারীবাদী বয়ানরীতিকে সাহসিকতার সঙ্গে সাহিত্যে তুলে ধরে নারীর এ অবদমিত অবস্থার প্রতিকার প্রত্যাশা করেন। এক্ষেত্রে শাহীন আখতার বাংলাদেশের একজন স্বতন্ত্র নারীবাদী লেখক। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বে নারী-সমকাম আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একজন নারীবাদী সাহিত্যিকের মতামত:

> সমকামী লেখিকারা (লেখক শব্দটি ব্যবহার করতে পারলেই ভালো হতো, কিন্তু এখানে, সহজে বোঝার খাতিরে 'লেখিকা' শব্দটি ব্যবহার করা হলো) 'সমকামিতা'কে নিছক শারীরিক তৃপ্তির মাধ্যম, 'বিকল্প জীবন ব্যবস্থা' কিম্বা সংখ্যালঘু কোন গোষ্ঠীর চাহিদা হিসেবে দ্যাখেন না বরং প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সুক্ত, যা নারীর জন্য পুরুষকেই একমাত্র কাম্য ও আরাধ্য বলে মনে করে, সেই সুক্তকেই প্রত্যাখান করে নিঃসীম অবহেলায়।[৩০]

সমকামিতা মানুষের স্বাভাবিক যৌনচিন্তার অন্যতম উপাদান হলেও এ প্রসঙ্গটিকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকক্ষেত্রে সচেতনভাবে এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। এ দেশের পুরুষশাসিত সমাজকাঠামোতে সমকাম-প্রসঙ্গ সাধারণ নিয়মাচারের বাইরে থাকে বলে নারী-সমকাম এক নিষিদ্ধ বস্তুতে শৃঙ্খলিত। নারী-লেখকরাও এ প্রসঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করেন:

> অ্যাকাডেমিক নারীবাদীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নারীসমকামিতাকে স্বীকার করেননি, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য তাই তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। কিন্তু নারীসমকামিতার বাস্তবতাকে স্বীকার না করে উপায় নেই, বিশেষ করে গত কয়েক দশকে পশ্চিমের অসংখ্য নারী এই সমকামিতাকে তাদের জীবনযাপনের অনিবার্য অংশ করে নিয়েছেন। এটি পেয়ে গেছে আইনি বৈধতা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। নারীসমকামিতার রাজনৈতিক তাৎপর্য তাই অনস্বীকার্য।[৩১]

বিপরীত কামের বিপরীতে সমকামকে অধিক যৌক্তিক সম্পর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব। শাহীন আখতারের ছোটগল্পে আছে নারীর সমকামিতার প্রসঙ্গ। নারীর দেহের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণের সূত্রেও সমকামী-সম্পর্কের গল্পগুলোকে পাঠ করা যায়। এ ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'সাপ, স্বামী, আশালতা ও আমরা'। গল্পের নামে 'আমরা' নামকরণের মধ্যে নারীর সামূহিক কণ্ঠস্বর আছে। গল্পকথক-নারীটির সংকট যে কেবল তার একার সংকট নয়, সম্মিলিত সংকট, যা আরও অনেক নারীর জীবন সংকট – 'আমরা' নামের মধ্যে সেটি স্পষ্ট। 'এখানে আমাদের পরিত্রাণের কোনো আশা নাই, আমরা যদি কোথাও চলে যেতে পারতাম!' – পলায়নের নয়, এই আক্ষেপ আশাহীনতার। 'আমরা' যেমন গল্পে নারীর সংকটের বহুবচন তেমনই আশালতা নামের মেয়েটি নারীর আশাবাদের মানুষী রূপ। সামাজিক আচারনিষ্ঠ জীবনে আটকে পড়া নারীর দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি হিসেবে সমকামিতার প্রসঙ্গ বিশেষ উপাদান হিসেবে এসেছে শাহীন আখতারের

ছোটগল্পে। নারীর যৌনতার সংকটকে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর থেকে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার:

> 'আমরা রাতে সাপ-স্বপ্ন দেখি।' বলে আমরা ভারমুক্ত হই। এবং মনশ্চিকিৎসকের পর, একজন ক্ষুধার্ত নারী, যে নিজে সাপ-স্বপ্ন দেখে, তার কাছেই পারিত্রাণের উপায় আশা করি।[৩২]

সমব্যথী নারীর কাছে আপন দুঃখ ও কষ্টসহ নিজের মনকে মেলে ধরতে পারার স্বাধীনতা নারীকে নারীর প্রতি নির্ভরশীলতার দিকে, নারীপ্রেমের দিকে ধাবিত করে। সমকাম-তত্ত্ব নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া বহুমাত্রিক অন্যায়ের প্রতিবাদ ও উত্তরণহীন পুরুষতন্ত্রকে প্রত্যাখানের একটি উপায়। এ গল্পে 'আমরা' বা 'বরেরা' জাতীয় বহুবচনবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য ব্যবহার করে গল্পকার একজন নয়, বরং অনেক নারী-পুরুষের সংকটের প্রতীকী প্রেক্ষাপটকে সংযুক্ত করেছেন গল্পকথকের ব্যক্তিগত সংকটের সঙ্গে। 'বর–সাপ, না মানুষ; মানুষ, না সাপ।' – সম্পর্কে আস্থাহীন নারীর যৌন অবদমন স্বপ্নে সাপ দেখার তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। বিবাহিত নারীর যৌনতা একটি 'ক্লোজড ফাইল', যা আলমারিতে তালাবদ্ধ হয়ে আছে – এ রকম উপমা নির্মিত হয়েছে গল্পে। শরীরী অবদমনের শিকার শিক্ষিত নাগরিক উচ্চবিত্ত গল্পকথক যেমন স্বপ্নে সাপ দেখে, একই সমান্তরালে দরিদ্র আশালতা যার স্বামীর 'জিহ্বা ছাড়া সর্বাঙ্গ অবশ' সেই আশালতাও 'রাইতে হাপ' দেখে। জঠর-যন্ত্রণা ও শরীরী যন্ত্রণা উভয়ই আশালতাকে দগ্ধ করে। তথাপি দরিদ্র আশালতার দারিদ্র্য যৌনতার চেয়েও অনেক বড় প্রসঙ্গ। ফলে তার অস্তিত্বচিন্তা গল্পকথক নারীর চেয়ে ভিন্ন ও গুরুতর। পুনরাবৃত্তিমূলক সাংসারিক হীনমন্যতা ও প্রাত্যহিক বিবমিষাকর দাম্পত্য নিগড় ছেড়ে নারীর পরিত্রাণের যে কোনো পথ নেই, তা বর ও নারীর কথোপকথনে প্রকাশ পায়:

> বররা বলে, 'এতক্ষণ টয়লেটে কী কর?' আমরা অবাক হই, 'টয়লেটে?' তারা যুক্তি দেখায়, 'তা ছাড়া তোমাদের যাওনের আর জায়গা আছে?'
> আমরা বুঝতে পারি, তারা আমাদের বয়সের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাদের ধারণা, এখন আমাদের এমন এক বয়স, যে বয়সে মেয়েদের আর প্রেমিক জোটে না, রাতে কি দিনে কখনোই অভিসারের লগ্ন আসে না, নতুন করে বর পাওয়া যায় না। এই বররা তো আমাদের সৌভাগ্যের নিদর্শন। জনমভর সাপ-স্বপ্ন দেখলেও আমরা তাদের কাছ থেকে তালাক চাইব না।[৩৩]

সমকামিতার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রেম, সম-অধিকার, সন্তান জন্মদানের অপারগতা – এ সকল প্রসঙ্গ লেখকের গল্পে পাওয়া গেলেও সফল-সমকামের কথাচিত্র পাওয়া যায় না। কথকের অবস্থান থেকে আশালতার জীবনগত অবস্থান ভিন্ন। নিজের জঠরযন্ত্রণা দূর করার নির্মম প্রয়োজন ছাড়া অন্য সকল বিষয় তার কাছে অগুরুত্বপূর্ণ। গল্পকার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে আশালতার আর্থসামাজিক প্রতিবেশ-শাসিত মনস্তত্ত্বকে উন্মোচন করেন। গল্পে বর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রণয়ী আশালতাকে বাড়িছাড়া করে। নিয়ন্ত্রণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী আবারও স্বপ্নে সাপ দেখা শুরু করে। একই ধারার গল্প 'পুষ্পবাগ আবাসিক এলাকা'য় এমন একটি প্রতিবেশ নির্মিত হয়েছে, যা নারীত্বের প্রচলিত ধারণার ট্যাবু থেকে মুক্ত। সমকালীন সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত এ সকল প্রেক্ষাপট প্রতীকী হলেও অস্বাভাবিক নয়।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ

পুরুষ-আধিপত্যের আরেকটি প্রপঞ্চ ট্রান্সফোবিয়া[৩৪]। সমাজ প্রতিনিয়ত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি বৈষম্য, নিগ্রহ ও সহিংসতা চালায়। বাঙালি সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে মেনে না নেয়ার প্রবণতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণির মধ্যে বিদ্যমান। নারীবাদ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে এবং একে নারীর অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় হিসেবে মূল্যায়ন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদী ধারা নারীদের মধ্যে বৈভিন্ন্য ও বৈচিত্র্যকে মেনে নেওয়ার সূত্রে নর ও নারীর মতো তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য সমতা নিয়ে কাজ করে।

'আবারও প্রেম আসছে' তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের করুণ বাস্তবতার গল্প। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে সমাজ কদর্য দৃষ্টিতে দেখে। শরীরী পরিচয়ের কারণে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এই মানুষদের প্রতি নারী ও পুরুষ উভয়ই অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাকলেও তাদের অপৌরুষেয় গণ্য করার দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলত পুরুষতান্ত্রিক। কখনো কখনো দেখা যায় পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে তৃতীয় লিঙ্গের প্রতি রিরংসা ও জিঘাংসা। নারী ও পুরুষের কথায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি অগ্রহণযোগ্য ও অমানবিকতাপূর্ণ আচরণ প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ:

ক. 'ভাবি, বেশ্যা আর হিজড়া কখনো সত্য কথা বলে না,' ত্বরিত জবাব আসে সমীরের কাছ থেকে।[৩৫]

খ. কী দোস্ত, বিনোদনের জন্য একটা হিজড়া ধরে আনলি? বাউল-ফাউল পাইলি না কিছু![৩৬]

এই ধরনের মন্তব্য থেকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি সমাজে প্রচলিত অবমাননাকর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ট্যাবু সম্পর্কে গল্পকার পাঠককে সচেতন করেন। শুধু তা-ই নয়, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মানবিক অনুভূতি, প্রণয় ও বিরহের পরিচয় তুলে ধরেন গল্পকার:

> হু। আমি একজনেরে অগাধ ভালোবাসছিলাম। তার গা বানানো, শরীরের যত্ন নিয়া...মার পরে তারে ভালোবাসছিলাম। হয়তো তার গাটা বানালাম। আদর করলাম। পাশে শুলাম – এসব করতি ভালো লাগত। মেয়ে হতি ভালো লাগত। তার জন্য পাগল হয়্যে বাড়ি ছাড়ছি। সারা রাত কানছি – হায় আল্লা! সবাই সুখে আছে, আমারে কেন...কত হিজড়া আছে, তারা তো স্বামী নিয়া থাকতিছে। আমারে কোনোদিন সুখ দিলে না। যারে ধরি সে-ই পালায় যায়। হয়তো এক বছর, ছয় মাস। তারপর আর নাই। তার মুখে সারাক্ষণ মেয়েদের গল্প, নজরটা মেয়েদের দিকে বেশি – তোমারে নিয়া আর কতকাল থাকব! বিয়েশাদি, বাচ্চাকাচ্চা হবে না কিছু। আমার জীবন মাটি হয়ে যাবে...[৩৭]

এখানে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের আপন জবানবন্দিতে তাদের ব্যক্তিগত সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন শাহীন আখতার। 'আবারও প্রেম আসছে' গল্পে হিজড়া, নারী, পুরুষ – তিনের জীবনে প্রেম, সম্পর্ক ও যৌনতার অবস্থা তুলে ধরে হিজড়া সম্প্রদায় সমাজে এখনও কতটা অপমানিত ও অবহেলিত তার একটি স্পষ্টগ্রাহ্য চেহারা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন গল্পকার। একজন নারী ও একজন হিজড়াকে সমান্তরালে উপস্থাপন করে গল্পকার উভয়ের সংকটের বিভিন্নতাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে দেখান। গল্পশেষে হিজড়ার নির্মম পরিণতি চিত্রায়িত করে তাদের জীবনের অনিশ্চয়তাকে স্পষ্ট করে তোলেন। গল্পে নাগরিক মানুষের কুৎসিত কদর্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে নেয়ার অপরাধে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষটিকে হত্যা করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা শারীরিক, মানসিক, মৌখিক নিগ্রহের লক্ষ্যবস্তু হয়ে নারীর চেয়েও বেশি অবমূল্যায়নের শিকার।

নারীর ব্যক্তিত্ব ও জীবন-সংকট

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পতিত নারীর জীবন-আখ্যান বহুতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্থান থেকে রূপায়িত শাহীন আখতারের ছোটগল্পে। প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুন ও বিচার-প্রথার সঙ্গে নারীর ব্যক্তিত্ববোধের সংঘাত দেখিয়েছেন গল্পকার। এ সংঘাতে নারী পরাজিত মানুষ নয়। চরম বৈরিতার মধ্যেও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকে তাঁর গল্পের অনেক নারী চরিত্র। 'লিবারেল নারীবাদ এটাই দাবি করে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পরনির্ভর করে রেখে নারীর ব্যক্তিসত্তা বা আমিত্ব গঠনে বাধার সৃষ্টি করেছে। নারী যদি সুযোগ পায় তাহলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। সেজন্য লিবারেল নারীবাদ নারীমুক্তির কথা বলে। এ নারীবাদ মেধার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে।'[৩৮] আনন্দ-বেদনা, সংকট-সম্ভাবনা সংযোগে নারীর পরিপূর্ণ জীবন-আখ্যান শাহীন আখতারের ছোটগল্পের উপজীব্য। বিচিত্র কর্মপেশায় যুক্ত নারীদের নিয়ে লেখা গল্পসমূহকে মনে হয় এক বৃহৎ উপন্যাস। গল্পগুলোতে কাহিনির বিভিন্নতা থাকলেও সংকটে বিহ্বল না হয়ে মোকাবিলায় অগ্রসর এই নারীরা সকলে মিলেমিশে একটি আখ্যান।

'শ্রীমতীর জীবনদর্শন' গল্পের শ্রীমতীকে মনে হয় বাঙালি নারীর একটি আইডিয়া। নারীর নারীত্ব, সন্তান জন্মদান, সন্তানের জন্য স্নেহময়তা, প্রথাগত সতীত্বের ধারণা ও সমাজের দেয়া গ্লানি আর সকল কিছু ছাপিয়ে মাতৃত্ব শ্রীমতীর জীবনচক্রকে পরিপূর্ণ করে। সতীপনার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শ্রীমতীকে অনুল্লেখিত কোনো ঘটনাচক্রে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সন্তান হারাতে বাধ্য হতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জন্মদাত্রীর চেয়ে জন্মদাতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে মা ও সন্তানের জৈবিক সম্পর্ককে অবলীলায় অস্বীকার করতে সক্ষম। শ্রীমতীর তৃষিত মাতৃত্ব মনোবিকলনের ঘোরে দেখতে পায় তার ঘর ভরা সন্তান; পিতৃপরিচয়ের দোহাই এদের মধ্যে অনেককে ছিনিয়ে নিলেও তার কোলে থেকে যাবে কোনো না কোনো সন্তান:

> কোলে নবজাত সন্তান নিয়ে বঙ্গের এক উষর-লগ্নে শ্রীমতী ফিরে আসে। এ সন্তান শ্রীমতীর – এর চেয়ে সহজ কথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কী হতে পারে! অথচ শ্রীমতীর শঙ্কা ঘোচে না, সংশয় দূর হয় না। অপহৃত সন্তানের কথা মনে পড়ে। এতদিন পর এই প্রথম শ্রীমতী নানান সুরে কাঁদে। মানবজাতির মায়েদের হয়ে সে কেঁদে চলে। বলা বাহুল্য, এ বিলম্বিত ক্রন্দন শুধু মানুষেরই।[৩৯]

প্রচলিত অর্থে বাঙালি সমাজে মাতৃত্বকে মহিমান্বিত রূপে দেখা হয়। তবে মাতৃক্ষমতার শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে পুরুষের শরীরী বৈশিষ্ট্যের চেয়ে হেয়, নীচ ও অযোগ্য বলে মনে করার কূটাভাস সমাজে প্রচলিত আছে। বাঙালি মা আচারনিষ্ঠা ও কুসংস্কারের জন্য প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নারীর মাতৃত্ব ও প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক আইনের অসম যুদ্ধে মাতৃত্বের আবেগের জয় চিত্রিত হয়েছে 'শ্রীমতীর জীবনদর্শন' গল্পে। প্রকৃতি-পরিবেশসংলগ্ন নারী সন্তানজন্ম ও লালন-পালনকেন্দ্রিক জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রকৃতির মতোই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা ব্যবহৃত ও নিগৃহীত হয়:

> প্রকৃতির ক্ষতিসাধনে যেমন আবহমানকাল ধরে পুরুষ আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে আসছে, তেমনি সে-কারণে আবার নারীই তাতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরুষের তুলনায়। প্রকৃতি যখন ভালো থাকে, তখন সবাই ভালো থাকে। প্রকৃতির দুর্গতি হলে, সবাই দুর্যোগে পড়ে, তবে নারীই সর্বাগ্রে ও সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে।[৪০]

'শ্রীমতীর জীবনদর্শন' গল্পটি বর্ণনার বিচিত্র ঢঙে অত্যন্ত আঁটসাট; শ্রীমতীর বন্দনা, জীবনবৃত্তান্ত, মোহভঙ্গ তথা অন্তর্ধান ও প্রত্যাবর্তন – এই চারটি খণ্ডে বিভক্ত। 'শ্রীমতী' শব্দটি নারী শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রতিটি নারীর মর্মমূলীয় জীবনসংকটের প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

'আস্‌তান' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিন্দুবালা। বিন্দুবালা চরিত্রকে জীবনঅভিজ্ঞতায় ও দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ করেছেন শাহীন আখতার। বিন্দুবালা গরিব-সর্বহারা এক সৌন্দর্যসেবিকা। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ম্যাসেজসেবা দিয়ে 'হাতের তালুর মতো ঢাকা শহর যার চোখের সামনে ভেসে ওঠে'। নাগরিক ঢাকার বহুমানুষের কলমুখরতার মধ্যে বিন্দুবালা বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র সংগ্রামী মানুষ। নিম্নবিত্ত কর্মজীবী বিন্দুবালা শিশুসন্তানের ভরণপোষণের জন্য কাজ করে। তাকে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা ও অবহেলার কুৎসিত দৃষ্টি মেনে নিয়ে কাজ করতে হয়। বাস্তবতার নিরিখে বিন্দুবালা কারো সবিশেষ অনুগত নয়; অনাথ, বিধবা ও নিঃসঙ্গ বিন্দুবালার কাছে কর্মই মুখ্য। বিন্দুবালা নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব স্বনিষ্ঠতায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়া নারী। ম্যাসেজ পর্যায়ের ভোক্তা ও সেবিকাকেন্দ্রিক ঢাকার নাগরিক-বিশ্বের বিচিত্র বিবরণ আছে গল্পে। ম্যাসেজ গ্রহণকারী নারীরাও নিজ নিজ অবস্থানে বিচ্ছিন্ন, একাকী, বঞ্চিত ও দুঃখী। বিন্দুবালার বিজ্ঞ পেশাদারী আচরণের অভ্যন্তরে প্রবাহিত থাকে জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু নারীর জাতিসত্তার লুপ্ত স্মৃতিচারণা। 'আস্‌তান' গল্পের বিন্দুবালা তার আদিজন্মভূমির পরিচয় হারায়:

> অনেক অনেক দিন আগের কথা। এই দেশে রাস্তা বানানোর লাগি গোরকপুর, বালিয়া, মুঙ্গের, ভোজপুর থেইক্যা লোক ধরে আনা হইছিল। একে তো পানির কষ্ট, নিজের দেশে কাম-কাইজও নাই – মানুষগুলি কী খাইয়্যা বাঁচবে? আমার দাদা, দাদার বাবা এই সুযোগে চইল্যা আসে। রাস্তার কাজ হ্যাষে বাড়ি ফিরার পথ হারায় ফালায়। এমন বুকার বুকা আছিল।[৪১]

এভাবে বিন্দুবালা এক সংগ্রামী উন্মূলিত নারীর প্রতিনিধিত্ব করে। বিন্দুবালার এই শেকড় হারানোর যন্ত্রণা কেবল তাঁর জীবনঅভিজ্ঞতাই নয়; বরং তাঁর সামষ্টিক জীবনচিন্তার মূলে থাকে এই যাতনা: 'বিন্দুর স্বামী রামলালের আবাস কোথায়? বিয়ের মন্ত্র পড়ানোর সময় শুধু শুনেছিল – বালিয়া আস্‌তান। বালিয়া কোন দেশ? কতদূর? তার স্বামীও জানত না।'[৪২] এ কারণে উন্মূল নারী বিন্দুবালার একমাত্র স্বপ্ন একখণ্ড জমি। এ স্বপ্নপূরণে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত থাকে সে। বিন্দুবালা প্রকৃতপক্ষেই সাবঅল্টার্ন নারীর প্রতিভূ।

লেখকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় লেখা হয়েছে বেশ কয়েকটি গল্প। 'পাচার' গল্পের জেসমিনের সংকট আত্মপরিচয়ের। পনেরো বছর বয়সে ঢাকা থেকে ভারতে পাচার হওয়া জেসমিন জীবনের দুঃখবোধ ভুলতে বিশ বছর পরে দেশে ফিরে আবিষ্কার করে তার স্মৃতিরা লুণ্ঠিত হয়ে গেছে সময়ের প্রতাপে। জেসমিনের অনিশ্চিত অস্তিত্বভাবনায় বেদনাবোধেরও কোনো স্থান হয় না। নারী ও শিশু পাচার তৃতীয় বিশ্বের এক ভয়াবহ সত্য। পাচারকৃত মানুষ রাষ্ট্রের খাতায় কেবল একটি সংখ্যামাত্র। 'পাচার' গল্পে লেখক একেবারেই অনুপস্থিত থাকেন। জেসমিন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত গল্পটিতে সাবঅল্টার্ন নারীর মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত হয়েছে। 'মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষের মাঝে যে অহংবোধ বা স্বজাত্যবাদী ধারণা তৈরি করে তা প্রকৃতি ও নারীকে অবদমন ও কর্তৃত্বের মূল্যবোধ

সৃষ্টিতে সাহায্য করে।'[৪৩] জেসমিনের গল্পের উৎস লেখকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত বলে অনুমেয়।

'অপরপক্ষ' এক সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য। গল্পকারের কর্মজগতের অভিজ্ঞতা গল্পটির জন্মভূমি। বাস্তবতার নির্মমতা গল্পের মূল রসদ হলেও গল্পের প্রাণ মেহেরজানের প্রতিবাদী সত্তা। গল্পের মূল চরিত্র মেহেরজান বা সুফিয়া গ্রামীণ সম্পত্তিগত বিরোধের জের ধরে মর্মান্তিক শারীরিক নিগ্রহ ও যৌননির্যাতনের শিকার হয়। 'কিন্তু যার ইজ্জতের বিনিময়ে, অত্যাচারের বিনিময়ে নয়া আইনকানুন জারি হবে, সে নিজে কী পেয়েছে? ভুঁইয়ের অধিকার তো ফিরে পায়নি।'[৪৪] ভয়াবহ রোগে ভুগে জরায়ু হারিয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যায় সে। আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নিজের পৈতৃক ভুঁই বাঁচাতে যে সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হয়, তা বাঙালি নারীর অনন্য সাহসিকতার দৃষ্টান্ত। প্রান্তবর্তী সমাজের নারীর জন্য আইনি সহায়তা লাভ করা কতটা কঠিন ও দ্বান্দ্বিক, তার স্বরূপ আছে এই গল্পে। জেলখানায় নারী কয়েদির দুঃসহ জীবনের বর্ণনা আছে। প্রত্যন্ত গ্রামের নারী সুফিয়ার মাটির প্রতি যে গভীর মমত্ববোধ, তা তার অস্তিত্বচিন্তার মর্মমূলে প্রোথিত এক অধিকারবোধেরই রূপায়ণ। তৃতীয় বিশ্বের নারীর সংগ্রাম মূলত নিজের ও সন্তান-সন্ততির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ। সপ্রসঙ্গ লেখকের উক্তি: 'মেয়েদের জীবনটাই তো আন্দোলনের, বিদ্রোহের এক সম্ভাবনাময় আধার।'[৪৫] নারীর এই সংগ্রাম বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতার একটি জীবন্ত উপাদান; সমালোচক যাকে একটি পুরুষতান্ত্রিক অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন:

> আমাদের চারপাশে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার মধ্যে এই বোধ আছে যে, মেয়েদের দেয়া যাবে না। কেন দেয়া যাবে না তার কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা নেই। যে পুরুষের সম্পত্তি নাই, সেও উত্তেজিত, তার মনে হচ্ছে পুরুষ হিসেবে তার একটা অধিকার একটা জায়গা কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে মনোজগত, সংস্কৃতি, মতাদর্শ, পুরুষতন্ত্রের দাপট। এটা একটা অবস্থা।[৪৬]

'শিস' গল্পের জগৎ আশির দশকের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত। ছাত্রজীবনে একই ছাত্রীহলে থাকা মীরা ও আমরিন পুরোপুরি বিপরীত ধারার মানুষ হলেও উপেক্ষিত নারীত্বের আশাহীনতা ও অপ্রাপ্তির প্রেক্ষাপটে তারা একীভূত হয়। জীবনবোধের পার্থক্য এই দুই বিপরীত স্বভাবের নারীর জীবনে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে না। তারা দুজনেই অসুখী এবং সেখানেই তারা সমান্তরাল। মীরা ও আমরিনের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে একে অন্যের বর্ণনায় শেষ পর্যন্ত নারীর প্রতি নারীর গভীর শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতি-সচেতন লেখকের গল্পে সত্তর দশকের শেষের রাজনৈতিক পরিবেশে আমরিনের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনীতিকে নারীর চোখে দেখার সুযোগ পায় পাঠক। ছাত্রী হলের রাজনীতির ছবি আছে হলের নেত্রী চরিত্রে। সাধারণ মেধাবী ছাত্রী মীরার দুশ্চিন্তায় আশির দশকের রাজনীতি তার অস্তিত্ব জানান দেয়:

> তখন জলপাইরঙা পোশাকের তল থেকে সবে ছাত্ররাজনীতির বাচ্চা ফুটেছে। জারুল-কৃষ্ণচূড়ার ছায়াতল প্রকম্পিত করে হলের সামনে মোটরবাইকের আনাগোনা। আরোহীরা আমাদেরই সহপাঠী। ক্লাস-টিউটোরিয়ালের বালাই নেই। সরকারি ছাত্রদলের খাতায় নাম লিখিয়ে রাতারাতি নেতা বনে গেছে।[৪৭]

আশির দশকের উত্তাল রাজনীতির পটপরিবর্তন, ছাত্ররাজনীতির বিচিত্র ধারা, রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীর সঙ্গে ছাত্রীর সম্পর্ক, হল-প্রশাসনের ব্যর্থতা প্রভৃতি তথ্যে গল্পটি সমৃদ্ধ।

'ঠাণ্ডা চা' গল্পের রোজি, 'হাতপাখা' গল্পের খালাআম্মা, 'নাস্তিক' গল্পের নানীমা – এই চরিত্ররা নারী হিসেবে মুখোমুখি হয়েছে বহুবিধ জীবন-সংকটের। সংকটের মুখে এরা কখনো মুষড়ে পড়ে, আবার কখনো ঘুরে দাঁড়ায় নারীর সহজাত পরিশ্রমী ও সহনশীলতার শক্তিকে আশ্রয় করে। 'ভালোবাসার পরিধি' গল্পে ইতিহাসের সমান্তরালে দৃঢ়চেতা জীবনসংগ্রামী এক নারীর আখ্যান বর্ণনা করেছেন শাহীন আখতার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডিটেইলড বর্ণনা এই গল্পটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এগারো বছর বয়সে বিয়ে হলে মেয়েটির ভুবন গড়ে ওঠে বাঙালি নারীর সংসার-সম্পৃক্ততার অভ্যস্ততায়। যুদ্ধরত স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই নারীর কাছে সাংসারিক কর্মলিপ্ততা অস্তিত্বের সমান অর্থবাহী। বৈবাহিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী স্বামীর সংসার বৈরাগ্য ও একাকী জীবনযুদ্ধের নির্মমতার প্রতিচেতনায় ক্রমশ নির্বিকার, রূঢ় আর আবেগশূন্য হয়ে নিত্যতার মধ্যে সংসারযাপনকেই জীবনের সারসত্য জ্ঞান করেছে সে। এই নারীকে সকল বিপদে সহনশীল ও সকল দায়িত্বে নিষ্ঠ নারী হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন গল্পকার। বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও অভিঘাত নারীটির জীবনের পরিণতির নির্ণায়ক। ফৌজির জীবন, ঔপনিবেশিকতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, সৈনিকের সমকামিতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্বামীর অভিজ্ঞতা চিঠির মাধ্যমে জানতে পারে নারীটি:

> তাঁবুতে শুয়ে খালাম্মার স্বামীর নিজেকে মনে হয় কীটাণু কীট বা ফৌজি পোশাকে ভাড়া-খাটা চাকর, নিজের তনু-মনের ওপর যার হক নাই। ইংরেজের ডেকে আনা দুর্ভিক্ষে তাঁর দেশের লোক মাছির মতো মারা যাচ্ছে। বিনা প্রতিরোধে জাপানি ফৌজ ইম্ফল ডিঙিয়ে পাহাড়ে-অরণ্যে-লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কোহিমার পতন যখন-তখন। যুদ্ধাক্রান্ত মানুষগুলো তো নেটিভ, ওদের জীবনের মূল্য কী! বোবা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে খালাম্মার স্বামী ভাবেন, বেকার হোস্টেলের সেই সঙ্গীরা আজ কোথায়, যারা একদিন থিয়েটার রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্ন দেখেছিল – ইংরেজের অস্ত্র দিয়ে ইংরেজ খেদানোর![৪৮]

শেষ জীবনে স্বামীর প্রণয়ী শঙ্করণের সঙ্গে সাক্ষাতেও ভালোবাসার বিপুল পরিধিতে তাকে অবিচল, বিকারহীন, সহমর্মী ও ক্ষমাশীল হিসেবে দেখান গল্পকার।

শাহীন আখতারের বেশ কিছু ছোটগল্প নারীর সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণের তথা সরাসরি যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে রচিত। নারীমুক্তিযোদ্ধার বীরত্বের আখ্যান বাংলা সাহিত্যে দুর্নিরীক্ষ্য। মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা চিত্রিত হতে দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক প্রেক্ষণবিন্দু থেকে। এ ক্ষেত্রেও শাহীন আখতার স্বতন্ত্র। 'আমিরজানবিবির সংবর্ধনা', 'পাঁচটা কাক ও বীরাঙ্গনা', 'তিনি গুঁড়ো মরিচের ব্যবহার জানতেন' গল্পে তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা নারীর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। নারী-মুক্তিযোদ্ধারা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মান পাননি; বরং সামাজিকভাবে তাঁদের নানা ঘৃণিত প্রশ্নে জর্জরিত করা হয়েছে; শারীরিক শুদ্ধতার প্রসঙ্গে অসম্মান করা হয়েছে। 'আমিরজান বিবির সংবর্ধনা' গল্পে নারী-মুক্তিযোদ্ধাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে দেখা যায়। গল্পে মুক্তিযোদ্ধা বদর আলীর কণ্ঠেও সেই ক্ষোভ ঝরে পড়ে: 'দেশ স্বাধীন হইছে তাদের জন্য, যারা এদেশের বিপক্ষে ছিল।'[৪৯] সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তথাকথিত সাংবাদিক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে আমিরজান বিবিকে। নারী মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস সাংবাদিকের লক্ষ্য নয়; বরং নারী

নিগ্রহের রগরগে বিবরণ চায় পত্রিকা। সংবর্ধনা পেয়ে গ্রামে ফিরলে গ্রামের মানুষেরা আমিরজানের প্রতি বিন্দুমাত্র ফিরেও তাকায় না; বরং ব্যস্ত থাকে সাতখুন ও দশ ধর্ষণের অপরাজনীতির চর্চাকারী আসামি নেতাকে নিয়ে। এই প্রতীকী ঘটনাংশ থেকে প্রতীয়মান হয় নারী-মুক্তিযোদ্ধরা সমাজে কতটা অবমূল্যায়িত হয়েছেন।

উপসংহার

শাহীন আখতার তাঁর ছোটগল্পে নারীকে কীভাবে দেখতে চান – নারী হিসেবে, নাকি মানুষ হিসেবে? – সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্বের তুলনা-প্রতিতুলনার মধ্য দিয়ে। এইসব তত্ত্বের বিভিন্ন প্রান্ত শাহীন আখতারের ছোটগল্পে অর্গ্যানিকভাবে উপস্থিত থাকে। নারীবাদের একটি প্রাথমিক পর্ব উদারনৈতিক নারীবাদ। এক অর্থে এই মতবাদ উদারনৈতিক মানবতাবাদেরই অংশ। তাই উদারনৈতিক নারীবাদ নারীকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থাকে। অপরদিকে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ প্রচলিত অনেক তত্ত্ব ও মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ দ্বারা প্রত্যাখ্যাতদের মধ্যে উদারনৈতিক মানবতাবাদও আছে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নারীকে নারী হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়; কেবল মানুষ হিসেবে নয়। বাংলাদেশের স্থানিক পটভূমি ও আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতায় শাহীন আখতারের ছোটগল্পে যেসব পেশাজীবী নারী, নারীর জন্য নারী, শরীর-সচেতন নারী, অধিকার-কাঙ্ক্ষী নারীদের দেখা যায়, তাদের নির্মাণের মধ্য দিয়ে লেখকের নারীকে নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে নারী-অধিকার এত সংকুচিত ও স্বরহীন যে, এখানে কেবল উদারনৈতিক মানবতাবাদী দৃষ্টি দিয়ে মেয়েদের সমস্যাকে সার্থকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তাই বাস্তবতার পটভূমিতে এগুতে হয় বাড়তি সাহসিকতা নিয়ে। শাহীন আখতাররের গল্পকার সত্তার মধ্যে এই সাহসিকতা আছে। তাঁর রচিত গল্পগুচ্ছকে র‍্যাডিক্যাল বলেও এককভাবে বর্গভুক্ত করা যায় না। মূলত নারীবাদের বিভিন্ন উপাদান শাহীন আখতারের ছোটগল্পে উপস্থিত থাকলেও কোনো একক তত্ত্বের অনুগামী তিনি নন। বরং তাঁর স্বসমাজ, পরিপার্শ্বের বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তিনি যে বয়ান নির্মাণ করেন তাঁর ছোটগল্পে, সেখানে তত্ত্বের সমান্তরালে সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতাও উপলব্ধি করা যায়। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর পুরুষ-নিরপেক্ষ অবস্থান তৈরির চেষ্টা, বিভিন্ন সামাজিক ট্যাবু ভাঙা – এই প্রসঙ্গগুলোকে ছোটগল্পের পরিসরে ব্যক্ত করেছেন লেখক। তিনি দেখিয়েছেন গ্রামীণ ও শাহরিক নারীর পরিস্থিতিগত বৈভিন্ন্য এবং নারীত্বের অভিন্নতা; একই সঙ্গে নারীসত্তার সম্মিলন প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর গল্পে যেমন আছে গ্রামীণ প্রতিবেশে স্বাবলম্বী নারীদের কথা, একইসঙ্গে আছে নাগরিক পরিসরে অর্থনৈতিকভাবে অবলম্বনহীন নারীদের বিপর্যস্ত জীবন-কথন। নারীর সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ককেও শাহীন আখতারের গল্পে অনুভব করা যায়। তিনি যেমন তাঁর একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখান নারী-সমকামের প্রতি নারীর অবস্থান; কিন্তু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতার কারণেই হয়তো তার পরিপূর্ণতা বা পরিণতির রূপদান করেন না। শাহীন আখতারের গল্পে আছে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের নারীদের উচ্চারণ। এসবকিছু নিয়ে যে সামষ্টিকতা তৈরি হয়, তা বৃহত্তর অর্থে নারীবাদী সাহিত্য। কিন্তু নারীবাদের বিচিত্র ধারা নারীজীবন,

নারীর শরীর ও মনন, নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করলেও একরৈখিক কোনো সমাধানের পথনির্দেশ করে না। নারীবাদ এমন চিন্তাগুচ্ছ, যা মূলত চলমান; এবং ক্রমপ্রসারমাণ। শাহীন আখতারের ছোটগল্পও একমুখী বা একরৈখিক নয়। তাঁর গল্পপরিধির প্রধান অংশ জুড়ে থাকে নারী – বিচিত্র প্রতিবেশে তিনি নারীর বহুমাত্রিক প্রতিমা নির্মাণ করেন এবং নারীর নিজস্ব স্বর নির্মাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। এই বিবেচনায় শাহীন আখতারের নারীভাবনা তত্ত্বকে অতিক্রম করে গেছে; নারীবাদী ডিসকোর্সের কাঠামোপরিধির বাইরে জীবন্ত মানুষ হয়ে বাঙালি নারী বিচিত্র রং-রূপে হাজির হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে নারীজীবনের সংকট ও সম্ভাবনার বিচিত্র প্রান্ত উন্মোচিত হয়। বাংলাদেশের নারীর নিজস্ব সমস্যা ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবোধ শাহীন আখতারের গল্পকাঠামোর ভেতর দিয়ে যেভাবে ধরা পড়ে, তা বিশ্বের অপরাপর দেশের নারীবাদী সাহিত্যের বড় পরিসরের অংশ হয়েও বাংলাদেশের নারীকে স্বতন্ত্র স্বরে চিহ্নিত করে। এখানেই নারীবিশ্ব নির্মাণে ছোটগল্পকার হিসেবে শাহীন আখতারের সার্থকতা ও স্বকীয়তা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ শাহীন আখতার রচিত (২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত) গল্পগ্রন্থগুলো হলো: *শ্রীমতীর জীবনদর্শন* (১৯৯৭), *বোনের সঙ্গে অমরলোকে* (২০০১), *১৫টি গল্প* (২০০৪), *আবারও প্রেম আসছে* (২০০৬), *গল্পসমগ্র ১* (২০০৮), *শিস ও অন্যান্য গল্প* (২০১৩) ও *ভালোবাসার পরিধি* (২০২০)। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে গল্পসংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। এই সময়পর্বে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর পাঁচটি প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস এবং বেশ কিছু সম্পাদনা-গ্রন্থ। শাহীন আখতারের সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: *জানানা মহ্‌ফিল: বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা*, *নারীর একাত্তর ও যুদ্ধপরবর্তী কথাকাহিনি*, *সতী ও স্বতন্তরা: বাংলা সাহিত্যে নারী*। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের এই তালিকা নাতিদীর্ঘ হলেও তাৎপর্যপূর্ণ।

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', *কালান্তর*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ৩৬৪

৩ আমিনুর রহমান সুলতান, 'শিস ও অনান্য গল্প: সময়, জীবন ও বাস্তবতা', *পাতাদের সংসার*, শাহীন আখতার সংখ্যা, ৯ম বর্ষ, ৩১তম সংখ্যা, সম্পাদক: হারুন পাশা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৮৩

৪ দুপুর মিত্র, 'লেখার মাঝপথেই আমি বদলাই বা লেখার ফাঁকে ফাঁকে', *পাতাদের সংসার*, শাহীন আখতার সংখ্যা, ৯ম বর্ষ, ৩১তম সংখ্যা, সম্পাদক: হারুন পাশা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ২৪৪

৫ Elora Shehabuddin, *Sisters in the Mirror: A History of Muslim Women and the Global Politics of Feminism*, University Press Limited, Dhaka, 2022, p. 6-7

৬ শাহীন আখতার, 'সম্পাদকের নিবেদন', *সতী ও স্বতন্তরা: বাংলা সাহিত্যে নারী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সম্পাদনা: শাহীন আখতার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ. আঠাশ

৭ আনিসুজ্জামান, 'মুখবন্ধ', *সতী ও স্বতন্তরা: বাংলা সাহিত্যে নারী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. চৌদ্দ

৮ বাংলাদেশ-পর্বে নারী-লেখকদের মধ্যে জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-২০২১), দিলারা হাশেম (১৯৩৬-২০২২), রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১), মকবুলা মঞ্জুর (১৯৩৮-২০২০), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯), আনোয়ারা সৈয়দ হক (জ. ১৯৪০), সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭), শামীম আজাদ (জ. ১৯৫২), আকিমুন রহমান (জ. ১৯৬০), শাহীন আখতার (জ. ১৯৬২), তসলিমা নাসরিন (জ. ১৯৬২), নাসরীন জাহান (জ. ১৯৬৪), পাপড়ি রহমান (জ. ১৯৬৫), আফসানা বেগম (জ. ১৯৭২), অদিতি ফাল্গুনী (জ. ১৯৭৪) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

[৯] Peter Barry, `Feminist criticism and language', *Beginning THEORY: An Introduction to Literary and Cultural Theory*, Third Edition, Viva Books Private Limited, New Delhi, India, 2013, p. 121

[১০] Ruth Robbins, *Literary Feminisms*, Palgrave, New York, USA, Reprinted, 2017, p. 71

[১১] হারুন পাশা, 'শাহীন আখতারের গল্পের বিষয়-আশয়', *পাতাদের সংসার*, শাহীন আখতার সংখ্যা, ৯ম বর্ষ, ৩১তম সংখ্যা, সম্পাদক: হারুন পাশা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৬৬

[১২] বেগম আকতার কামাল, 'সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নারী', *বীজমন্ত্র*, সপ্তম সংখ্যা, সম্পাদক: রাফাত মিশু, সেপ্টেম্বর ২০১১, ঢাকা, পৃ. ৫

[১৩] সোহানা মাহবুব, 'পরিবেশ-নারীবাদ তত্ত্বের আলোকে অমিয়ভূষণ মজুমদারের *সোঁদাল*: একটি পর্যালোচনা', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১-২, সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৩

[১৪] শাহীন আখতার, *গল্পসমগ্র* ১, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৮

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[১৮] চিমামান্দা এনগোজি আদিচি, *আমাদের সবার নারীবাদী হওয়া উচিত এবং একটি নারীবাদী ঘোষণাপত্র*, অনুবাদ: শিমিন মুশশারাত, বাতিঘর, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ৪২

[১৯] শাহীন আখতার, *ভালোবাসার পরিধি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৪৭

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[২১] Hameeda Hossain, *CLAIMING OUR RIGHTS: Feminist Discourses in Bangladesh and South Asia*, University Press Limited, Dhaka, 2023, p. 136

[২২] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ২১৩

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

[২৪] Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A more Comprehensive Introduction*, Fourth Edition, Westview Press, Boulder, USA, 2014, p. 73

[২৫] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ৭৯

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[৩০] অদিতি ফাল্গুনী, *খসড়াখাতা: নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৩

[৩১] মাসুদুজ্জামান, *নারী যৌনতা রাজনীতি*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪৯

[৩২] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ৬৫

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[৩৪] 'ট্রান্সফোবিয়া' হচ্ছে একগুচ্ছ নেতিবাদী মনোভঙ্গির সমষ্টি, যা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য একটি সাম্যমূলক বিশ্ব গড়ে তুলতে প্রতিনিয়ত বাধা প্রদান করে চলেছে। ট্রান্সফোবিয়া শব্দটি একটি সামাজিক বৈষম্য হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। এটি একটি সামাজিক আচরণগত সমস্যা, যেখানে প্রথাগত লিঙ্গধারণার ঐতিহ্য মেনে না চলা ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জেন্ডারপরিচয়-অস্বীকারকারী, লিঙ্গ পরিবর্তনকারী, জেন্ডার-নিরপেক্ষ পোশাক পরিধানকারী, বাংলাদেশে হিজড়া জনগোষ্ঠীভুক্ত বলে পরিচিত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ – এই শ্রেণিসমষ্টি ট্রান্সফোবিয়ার প্রত্যক্ষ শিকার। বর্তমান প্রবন্ধে শাহীন আখতারের ছোটগল্পে বিধৃত বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি ট্রান্সফোবিয়া কীভাবে কার্যকর থাকে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৩৮] রাশিদা আখতার খানম, 'নারীবাদী তত্ত্ব ও মতিজানের মেয়েরা', *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, সম্পাদনা: বেগম আকতার কামাল, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪৮

[৩৯] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ৮৮

[৪০] মাসুদ রহমান, *নিসর্গ-নারীবাদ*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ২১

[৪১] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ৪১

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[৪৩] মন্দিরা চৌধুরী, 'প্রকৃতি ও নারী: একটি নীতি-দার্শনিক মূল্যায়ন', *দর্শন ও প্রগতি*, বর্ষ ৩৯, ১ম ও ২য় সংখ্যা, সম্পাদক: শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ৯৬

[৪৪] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ২৩৪

[৪৫] শাহীন আখতার, 'সূর্যাস্ত আইন: এক দশক আগে-পরে', *গদ্যসংগ্রহ* ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৭৮

[৪৬] আনু মুহাম্মদ, *নারী, পুরুষ ও সমাজ*, সংহতি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২২২

[৪৭] শাহীন আখতার, *শিস ও অন্যান্য গল্প*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১

[৪৮] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০২০, পৃ. ১৬

[৪৯] শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, ২০১৬, পৃ. ১৪৫